KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7·5"×6"
Vol. & Number : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ আশ্বিন ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

পত্র।

—:০:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তোমার চিঠির জবাব অনেক দিন হ'ল লিখে রেখেছি, কিন্তু কতকগুলি দৈব-ঘটনার ধাক্কায় এতদূর অব্যবস্থিত চিত্ত হ'য়ে পড়েছিলুম যে, এতদিন সে জবাব তোমাকে পাঠাতে পারি নি। ব্যাপার যা ঘটেছিল বল্‌ছি। প্রথমে আবির্ভূত হ'ল—Reform Scheme, তার পিঠ পিঠ এল—ভূমিকম্প, তারপর দু'দিন না যেতেই ঘাড়ে পড়্‌ল—যুদ্ধজ্বর, তারপর দেখা দিল অকাল-নিদাঘ। এ জ্বরে যে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে বিপদ দেশশুদ্ধ লোক মাথা পেতে নিয়েছে, আমি যে তা আমার দেহকে স্পর্শ কর্‌তে দেব না, আমার প্রকৃতি ততটা অসামাজিক নয়। এই যুদ্ধজ্বরে ছুঁলে মানুষের যে মাথা ঘুলিয়ে যায়, সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এর উপর যদি আবার এই সব আকস্মিক উপদ্রবের কার্য্য-কারণ ও ফলাফল নিয়ে ঘরে বাইরে ঘোর ও জোর তর্ক কর্‌তে হয়, তাহ'লে মানুষের মাথার অবস্থা যে কি রকম হয় তা সহজেই বুঝ্‌তে পারো। ও অবস্থায় চিঠি ডাকে দেওয়া প্রভৃতি ছোটখাটো সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি ব্যক্তিবিশেষ যদি মাসাবধি কাল উপেক্ষা করে, তাহ'লে তার বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা এই মাসখানেক ধরে' কি কি বিষয় নিয়ে কোন্ কোন্ তর্ক করেছি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি। এই আষাঢ়ে গ্রীষ্ম ভুঁইফুড়ে উঠেছে কিনা, অর্থাৎ তা ভূমিকম্পের ফল কিনা, অথবা দেশের এতটা গা গরম হবার কারণ এই কিনা যে, আমাদের মাতৃভূমির গায়েও যুদ্ধজ্বর হয়েছে, তারপর ভূমিকম্পটা জ্বর আস্‌বার আগে পৃথিবীর দেহের কাঁপুনি মাত্র, না আর কিছু, এই সব গুরুতর সমস্যা নিয়ে আমার চারপাশে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নানারূপ বৈজ্ঞানিক, অ-বৈজ্ঞানিক এবং অতি-বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলেছে। এবং আমাকে তাতে বরাবর যোগদান কর্‌তে হয়েছে।

এ সকল বিষয়ে নীরব থাক্‌লে আমি যে স্বদেশ ও স্বজাতির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে বিষয়ে অবশ্য কারও মনে আর কোনও সন্দেহ থাক্‌ত না।

তর্কে অবশ্য এ সকল সমস্যার কোনও কালে মীমাংসা হয় না, এবং হ'তে পারে না। অতএব এবং অতঃপর ভোটে স্থির হ'য়ে গেল, যে Reform Scheme-এর জন্ম হচ্ছে এই সব নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক উৎপাতের কারণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে পড়েছ ত যে, বুদ্ধদেবের জন্মের সময় জম্বুদ্বীপে কি প্রলয় ব্যাপার ঘটেছিল, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সব পর্ব্বত হ'য়ে গিয়েছিল হ্রদ আর সব হ্রদ হয়ে গিয়েছিল পর্ব্বত।

অতএব সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে দাঁড়াল এই যে, এই অকাল-নিদাঘের কারণ যুদ্ধজ্বর—এই যুদ্ধজ্বরের কারণ ভূমিকম্প এবং এই ভূমিকম্পের কারণ Reform Scheme, কেননা ঐ Scheme সম্বন্ধে বাসুকী অসম্মতিসূচক মাথা নেড়েছেন। এর কারণও স্পষ্ট, "শেষ" যে Extremist, সে কথা যে কোনও অভিধানে বাচিয়ে নিতে পারো।

সে যাইহোক্, এই Reform Scheme-এর স্পর্শে আমাদের মনের দেশে যে একটা বেজায় ভূমিকম্প হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে এবং তার ভিতর দিয়ে বেরচ্ছে এখন অনর্গল ধোঁয়া। আমার জনৈক রাসায়নিক বন্ধু বলেন, সে ধোঁয়া Poisonous gas! যে ধোঁয়ায় আমাদের দেশ আজ ছেয়ে ফেলেছে, তা বিষাক্ত হোক্ আর না হোক্, তা যে আমাদের চোখে ঢুকেছে তার আর সন্দেহ নেই, কেননা আমরা কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, কাজেই সে চোখ কেবলই রগ্‌ড়াচ্ছি, আর লাল কর্‌ছি। এই ত আমাদের অবস্থা।

আসল কথা এই, এই কলিকাতা মহানগরীতে আমারা যা হয় একটা হুজুগ না নিয়ে বেশি দিন থাক্‌তে পারি নে। যদি একটা টাট্‌কা হুজুগের মাল বাইরে থেকে না আসে, তাহ'লে আমরা তা ঘরে বসে বানাই। ঐ হচ্ছে একমাত্র স্বদেশী industry, যাতে আমরা সম্পূর্ণ কৃতীত্ব লাভ করেছি। আমাদের ধারণা, আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে হুজুগ হচ্ছে একটা প্রধান উপায়। সম্প্রতি একটা হুজুগের অভাবে আমরা একটু মিইয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আমাদের কপাল গুণে Reform Scheme আমাদের হাতে এসে পড়্‌ল, অমনি তাই নিয়ে আমরা একটা মহা গোলযোগ বাধিয়ে দিয়েছি। এ হুজুগে যে আমিও মাতি নি, সে কথা বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে।

আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এমন একটি সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, যে ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যত অনেকটা স্থির হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় ভয়ের কথাও ঢের আছে, ভরসার কথাও ঢের আছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাদের চিত্ত ব'লে একটা পদার্থ আছে তাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সাহিত্যে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হ'লেও ব্যবহারিক জীবনে জাতিগত প্রাণ; কেননা আমাদের জাতি ব'লে কোনও একটা জিনিষ নেই। সাহিত্য জগতে অবশ্য এমন সব মুক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যাঁরা স্বদেশের খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও নির্ব্বিকার চিত্তে কাব্যকলার চর্চ্চা করে গেছেন, যথা—Leonards da Vince এবং Gœthe, কিন্তু এঁরা হচ্ছেন মনোজগতের স্বর্লোকের অধিবাসী, আর আমরা হচ্ছি তুচ্ছ ভূ-লোকের। সুতরাং তাঁদের পক্ষে যা শোভা পায়, আমাদের পক্ষে তা ধৃষ্টতা মাত্র। ভাগবতে দেখ্‌তে পাই, শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে, তাঁদের কার্য্যকলাপ সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণীয় নয়।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—এ উপদেশ অর্জ্জুনের জন্য, তোমার আমার জন্য নয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—অতএব কর্ত্তব্যও নয়।

ফরাসী কবি Theophile Gautier-এর কাব্য আমার নিকট চিরদিনই আদরের সামগ্রী; তবুও তাঁর Emaux et Camées-এর গৌরচন্দ্রিকা আমার কাছেও চক্ষুঃশূল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে যিনি প্যারিসে বসে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে স্ত্রীজাতির কর-চরণ-বসন-ভূষণের বিষয় কবিতা রচনা করেছিলেন, তিনি অবশ্য এক-জন অতি বাহাদুর লোক। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে নিজকে Gœthe-

এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, ঐ কথাটাই আমার কানে খারাপ লাগে। কেননা কবি হিসেবে Gautier-এর সঙ্গে Gœthe-এর সেই প্রভেদ কাব্য হিসেবে Mademoiselle de Maupin-এর সঙ্গে Faust-এর যে প্রভেদ। সুতরাং Gœthe-র পক্ষে যে ঔদাসিন্য স্বাভাবিক Gautier-এর পক্ষে তা নিতান্তই কৃত্রিম। এই কারণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী জর্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ প্যারিসে বন্দী হয়ে Gautier-র মন্ত্র-শিষ্য Banville যে সব Idylles Prussiennes রচনা করে-ছিলেন, আমার কাছে আজকের দিনে তাঁর গুরুর কবিতার চাইতে তা ঢের বেশি উপাদেয়। এ সকল কবিতা Banville-এর বুকের তাজা রক্তে ছোপানো কিন্তু তাতে ক'রে সে সব কবিতার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, কেননা তার ভিতর অতিরঞ্জিত কিছুই নেই। যে রক্তে তাঁর কবিতা রঞ্জিত, সে রক্ত হচ্ছে কবির বুকের রক্ত; সাধারণ লোকের নয়, সুতরাং হিংসায় তা বিকৃত নয়, মদে তা কলুষিত নয়। Banville নিজেকে কাব্য-রাজ্যের বাজিকর বলে' পরিচয় দিয়েছেন। সেই বাজি-কর এক্ষেত্রে বেদনার বলে যাদুকর হয়ে উঠেছেন। এই সব কবিতা এত যে মর্ম্মস্পর্শী—তার কারণ Banville মানুষের মনের কথা দেবতার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিজীত ফ্রান্সের শোক যাঁর অন্তরে বিজয়ী শ্লোকে পরিণত হয়েছে, তাঁর প্রাণের বেদনা বিশ্বমানবের চির-আনন্দের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। তবে সাহিত্যিকদের পক্ষে পলিটিক্স সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অসম্ভব হলেও নির্লিপ্ত থাকা যে কর্ত্তব্য Gautier-এর একথা আমি মান্য করি।

Banville-র চিত্তচাঞ্চল্য কাব্য-জগতে যে স্থির সৌদামিনী হয়েছে, তার কারণ তাঁর রাগ বিরাগ, তাঁর আশা নৈরাশ্য, তাঁর হাসি

কান্নার মূলে ছিল পেট্রিয়টিজম্—পলিটিক্স্ নয়। এর প্রথমটি সাহিত্যের বিষয় হলেও দ্বিতীয়টি নয়। পেট্রিয়টিজম্ ও পলিটিক্স্ যে এক বস্তু নয়, তার প্রমাণ,—নিত্য দেখতে পাওয়া যায় যে, যার দেহে পেট্রিয়টিজমের লেশমাত্র নেই, তিনিও পলিটিক্সের দরবারে উচ্চ আসন অধিকার কর্‌ছেন। অনেকের ধারণা, পলিটিক্স পাকা কর্‌তে হলে পেট্রিয়টিজমকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে এ কথাও সত্য যে পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে হলে পলিটিক্সকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। এ কথার ত ভুল নেই যে, পলিটিক্স পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত করে। একমাত্র শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটালে প্রাচীন সমাজ যদি রাতারাতি নবীন হয়ে উঠ্‌ত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। সাহিত্যের ভাবনা পলিটিক্সের ভাবনার চাইতে ঢের বেশি গুরুতর—কেননা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রাচীনকে নবীন করা। সে যাইহোক্ সরস্বতীর সেবকদের পক্ষে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকাই কর্ত্তব্য। ও যুদ্ধে সাহিত্যিকেরা যোগদান কর্‌লে পলিটিক্সেরও বিপদ সাহিত্যেরও ক্ষতি।

সাহিত্যিকেরা পলিটিক্সে কি গোল বাধান সে সম্বন্ধে নানা পলিটিসিয়ান নানা কথা বলেছেন, সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাঁদের সকল কথার সারমর্ম্ম এই যে, পলিটিক্সের আসরে সাহিত্যিকের আসা পলিটিক্স ব্যবসায়ীদের কাছে তদ্রূপ ভয়াবহ, জুরির বাক্সে স্কুল মাষ্টারের বসা আইন ব্যবসায়ীদের কাছে যদ্রূপ ভয়াবহ। তবে যে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের দলে টান্‌বার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তার কারণ সারস্বতদের হাতে কলম নামক একটি বস্তু আছে,

যা নাকি অস্ত্র হিসেবে তলোয়ারের চাইতেও জবর। কলমের মুখ তলোয়ারের চাইতে বেশি ধারালো হোক্ আর না হোক্ এ যুগে অসিজীবীর চাইতে মসিজীবীর প্রতাপ বেশি বই কম নয়। পুরাকালে রাজনীতির লড়াই রাজায় রাজায় হ'ত, সুতরাং রাজার অস্ত্র তরবারীই ছিল সে কালের প্রধান অস্ত্র; একালে রাজনীতির লড়াই হয় রাজায় প্রজায়, সুতরাং প্রজার অস্ত্র কলমই হচ্ছে একালের প্রধান অস্ত্র। এই কারণে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের এলেম চান্ না—চান্ শুধু তাদের কলম। কিন্তু কলম হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিষ যা কাউকে ধার দেওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বচন এই যে—

"লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতাগতা।
কদাচিৎ পুনরায়াতা ভ্রষ্টা মুষ্টা চ চুম্বিতা॥"

এই কারণেও পলিটিক্সের হাটে বাজারে কলম আমাদের সাম্‌লে রাখাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে এই যে, পলিটিক্সের রাজ্য আমাদের দেশ নয়। ওদেশে গেলে আমাদের জাত যায়, কেননা আমাদের যা ধর্ম্ম, ওরাজ্যে তার চর্চ্চা কর্‌বার যো নেই। ওদেশে টিঁকে থাক্‌তে হলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে পরের মতের ছাই চাপা দিতে হয়। পলিটিকাল জগতে এক অদ্বৈতবাদ ছাড়া অপর কোনও বাদ চলে না। যে দলেই যাও দেখ্‌তে পাবে নেতারা নিজেদের বল্‌ছেন "সোঽহং" আর নীতরা তাঁদের বল্‌ছেন "তত্ত্বমসি।" আমাদের পক্ষে অবশ্য অদ্বৈতবাদী হওয়া অসম্ভব, কেননা আমাদের মনের

যত কারবার সে সবই এই বহুরূপী বিশ্বের সঙ্গে, আর সেই কারণেই আমরা বহুবাদী। তারপর, পরের মতে সায় দিয়ে আমরা আমাদের মনের স্বাধীনতা হারাতে প্রস্তুত নই। কেননা স্বাতন্ত্র্যের চর্চ্চাটা আমাদের একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিলোক তার নিজের স্বাধীনতা না হারালে সমগ্রজাতি যে তার স্বাধীনতা লাভ করে না, যে গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, সে শাস্ত্রে আমাদের দখল নেই। সে যাই হোক্ পলিটিক্‌সে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয়, যার অর্থের সন্ধান নিতে গেলে ওক্ষেত্রে অনর্থ ঘটে। তারপর পলিটিক্‌সে স্বপক্ষ-বাৎসল্য ও বিপক্ষ-বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ অতি মাত্রায় চর্চ্চা করতে হয়, নচেৎ দল বাঁধা যায় না। এ ক্ষেত্রে উদারতা দুর্ব্বলতা এবং নিরপেক্ষতা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই গণ্য। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে যে কতদূর লাঞ্ছিত গঞ্জিত, পীড়িত ও বিড়ম্বিত হ'তে হয়, ইতিহাসে তার একটি মস্ত বড় উদাহরণ আছে—বেচারা Cicero! তার লাঞ্ছনা যিশুখৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে সুরু হয়েছে, আজও তার শেষ হলো না; রোমের জের এখন জর্ম্মাণী টানছে। অথচ Cicero-র অপরাধ কি?—তিনি থেকে থেকেই সাহিত্য চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে রোমের Republic রক্ষা করতে প্রাণপণ বাক্যব্যয় করতেন। ফলে সে Republicও রক্ষা হয় নি এবং সাহিত্যের republic-এও তিনি যথাযোগ্য স্থান পান নি। পলিটিক্‌সের শাস্তিভোগের হাত থেকে তিনি আত্মহত্যা করেও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পলিটিক্‌সের চর্চ্চা ত দেশশুদ্ধ লোকে করে, এমন কি এ ক্ষেত্রে রাম-শ্যাম-হরি ত জ্যেষ্ঠ অধিকারী বলেই গণ্য! তবে Cicero-র উপর নানা-দেশের নানা-লোকের নানা-ভাষায় নানা-রকম

কটু কথার কারণ কি? কারণ এই যে, এ চর্চ্চায় তিনি স্বাধিকার প্রমত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, ভগবান তাঁকে অসাধারণ বাক্‌শক্তি দান করেছিলেন, সেই শক্তি তিনি পলিটিক্‌সে অপব্যয় করেছিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই তাঁকে অদ্যাবধি করতে হচ্ছে। আণ্টনীর ধর্ম্মপত্নী Fulvia, Cicero-র ছিন্নমস্তকের মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে' যে স্বামীভক্তির পরিচয় দিয়েছিল, আজকের দিনে অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত তাঁদের লেখনীর নিষ্ঠিবন Cicero-র প্রেতাত্মার গায়ে নিক্ষেপ করে, সেই স্বামী ভক্তির পরিচয় দিচ্ছেন! অবশ্য এঁদের স্বামী আণ্টনি নন—Cæsar, জার্ম্মাণদেশে যিনি Kaiser রূপ ধারণ করেছেন।

এইখানেই থামা যাক্, নচেৎ তুমি বল্‌বে আমি শুধু বিদ্যে দেখাচ্ছি। অবশ্য ও অপরাধের ভয়ে নিরস্ত হবার কোনরূপ কারণ নেই। পলিটিসিয়ানরা যদি মাঠে ঘাটে চিৎকার করে' তাঁদের অবিদ্যা জাহির করতে কুণ্ঠিত না হন, তাহ'লে আমরাই বা আমাদের বিদ্যে জাহির করতে কুণ্ঠিত হব কেন?

থামা উচিত এই কারণে যে, কলিকাতা সহরের হাল পলিটিক্‌সের সূত্রে, সেকালের রোম এবং একালের প্যারিসের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কথা পেড়ে আমি বিদ্যের পরিচয় দিতে পারি কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি নে। তা ছাড়া কোথায় Cicero আর কোথায় আমরা। তাঁর হাতে ছিল ভাষার বিদ্যুন্মণ্ডিত বজ্র, আর আমাদের হাতে আছে টিনের ঝুমঝুমি। তবে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সাহিত্য বিভাগ অপরাপর বিভাগ থেকে অনতিবিলম্বে পৃথক হওয়াই কর্ত্তব্য।

অপর জাতের পক্ষে যাই হোক আমাদের মনের উপর পালটিক্‌সের ধাক্কা মাঝে মাঝেই আসা চাই—নইলে আমরা কাব্য পড়্‌তে পারি কিন্তু গড়্‌তে পার্‌ব না। আমাদের সমাজ এতই একঘেয়ে, এতই জড়ভরত যে, সে সমাজ নিত্য নতুন ঘা দিয়ে আমাদের মনকে জাগ্রত রাখে না, আর কাব্য-কলাও ঝিমন্ত মনের সৃষ্টি নয়। পলিটিক্‌সের উত্তেজনা ক্ষণিক হলেও উত্তেজনা ত বটে, অতএব স্বল্পমাত্রায় ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। পলিটিক্‌স সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যা অকর্ত্তব্য সে হচ্ছে ও-বিষয়ে কিছু লেখা। কেননা এ বিষয়ে কলম চালাতে গেলে style-এর মাথা খেতে হবে। পলিটিক্‌স লিখ্‌তে হবে প্রথমত ইংরাজিতে, তারপর খবরের কাগজের ভাবে ও ভাষায়। কাগ্‌জি ভাবে যে গোঁড়া ভাব এবং কাগ্‌জি-ইংরাজি যে পাতি-ইংরাজি, তার পরিচয় লাভ কর্‌তে বেশীদূর যেতে হবে না, "বেঙ্গলী" কিম্বা "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লেই এ সত্যের সাক্ষাৎ মিল্‌বে। মণ্টেগু সাহেবের রিপোর্ট নিয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে এত যে মতভেদ ঘটেছে তার সর্ব্বপ্রধান কারণ—সে রিপোর্ট খাঁটি ইংরাজিতে লেখা। অপর পক্ষে "রউলট কমিশন"-এর রিপোর্ট সম্বন্ধে যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে দু'মত নেই, তার কারণ—সে রিপোর্ট পাতি-ইংরাজিতে লেখা।

এই সব কারণে, অতঃপর এই Reform Scheme-এর হুজুগ থেকে আলগা হ'তে চাই। কিন্তু যা চাই তাই কি ঘটে? পলিটিক্‌সেরও একটা নেশা আছে, আর সে নেশায় যে একবার মেতেছে তার পক্ষে ও জিনিষ ছাড়া বড় কঠিন। একটি বাঙলা গানের অস্থায়ী আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার কারণ—গানটির

কথাগুলি যেমন pathetic, তার সুরও তেমনি উচ্চ অঙ্গের—একেবারে মালকোষ!

সে গানের প্রথম পদ এই—

"ছাড়্‌ব বল্‌লে কি ছাড়া যায়!
এ ত কাক নয়, কোকিল নয়,
যে হুস্ করলে উড়ে যায়!"

এ কবিতায় অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—কেননা ভালবাসা মাত্রই নেশা, আর নেশা মাত্রের-ই একটা মৌতাত আছে।

২০শে আগষ্ট, ১৯১৮ খৃঃ।

বীরবল।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।

—:০:—

বিশ্বসৃষ্টির পর বিধাতা পুরুষ এক জোড়া মানুষের মাথায় প্রকাণ্ড কেতাবের বোঝা চাপাইয়া ধরাতলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্র জিনিসটা এক ভাবে খুবই সহজবোধ্য। তবে এরূপ সহজবাদীদের দলে ভিড়িতে অতি বড় ভূতভক্তও এখন বোধ হয় একটু পশ্চাদ্‌পদ, কারণ শাস্ত্র-সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আদি ও অকৃত্রিম হইলেও ইহা একেবারে নিরেট খেয়ালের কোটাতেই ঠাসা, জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত বাতাস তাহাতে একটুও লাগিবার জো নাই। কিন্তু এদিকে কালের এমনি প্রভাব, কোন প্রকার গোড়ামিই এখন আর নিজের অটল অন্ধতার উপর খাড়া থাকিয়াই তৃপ্ত নয়, যুক্তি তর্কের খোলা পথে কোন রকমে একটু চলিবার আশায় বেজায় ব্যগ্র, তা সহজ গতিতেই হোক্, আর তির্য্যক্ ভাবেই হোক্।

মানুষ ও কেতাবী শাস্ত্র বিশ্বস্রষ্টার যমজ সন্তান, এইরূপ মত যদি কোথাও কাহারও থাকে, তবে সেটার আমরা কিছুমাত্র সম্বর্দ্ধনা না করিয়া বিদায় দিতে পারি। কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকল তার্কিকই বোধ হয় এই মতটির পক্ষ হইয়া ওকালতি করিতে এখন কুণ্ঠিত। মনুষ্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আধুনিক অভিব্যাক্তিবাদ মানি আর না মানি, তাহাতেই বা এ বিষয়ে কি আসে যায়। মানুষ জীবপর্য্যায়ের

শেষ পরিণতিই হোক্, কিংবা কোন এডাম ও ইভের বংশধরই হোক্, মানুষ যে একেবারে পুঁথি বগলে করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নাই, এটা একটা মস্ত তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝিবার জিনিস নয়। অন্য দেশের শাস্ত্র প্রায় কথঞ্চিৎ একেলে—অনেকের গায়ে সন-তারিখের মার্কা মারা—সাহজাত্য লইয়া তাহারা মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেই পারে না।

আমাদের বেদ লইয়াই বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল। পণ্ডিতেরা এই বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণকে একমাত্র বেদেরই সন্তান সন্ততি বলিয়া প্রচার করেন। বেদে ভারতীয় সকল শাস্ত্র বিজ্ঞানের উদ্ভব কিনা ইহা ভাবিবার এখন আমাদের দরকার নাই। বেদের উদ্ভবটাই কি এইটাই এখন জ্ঞাতব্য। বেদ অপৌরুষেয় মানে যদি এই হয় যে ওটা মানুষের রচনা নয়, বিধাতৃদেব স্বয়ং উহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া আদি মানবের লাইব্রেরীতে রাখিয়াছিলেন, তবে সেটা এই আলোচনার একটা অন্তরায়ের মত হইয়া দাঁড়ায় বটে। কিন্তু এরূপ মতটা আমরা এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে প্রস্তুত নহি, শুধু পাল্টা জবাবে এইটুকুই বলিব, আগে বিধাতৃদেবের ভাষাটাই কি ঠিক হোক তারপর ও-কথা শোনা যাইবে। শুধু বৈদিক সংস্কৃতেই যে বিধাতা সাহিত্য বা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন, এটা আজও কিছুমাত্র প্রমাণ করা হয় নাই। কাজেই ও মতটা এখন মুলতুবিই রহিল।

তবে এটাই কি ঠিক নয় যে, শাস্ত্র মানুষ গড়ে নাই—মানুষই শাস্ত্র গড়িয়াছে। বিধাতা মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অমনি টোল খুলিয়া বসেন নাই এবং নবজাত জীবটিকেও আগে শাস্ত্রের বেত্রাঘাতে

গড়িয়া পিটিয়া তারপর কার্য্যক্ষেত্রে পাঠান নাই। বিধাতা শুধু ভারতবর্ষেরই বিধাতা নহেন, এবং তাঁহার টোল যদি থাকে, সেটা শুধু বৈদিক-সংস্কৃতচর্চ্চারই কেন্দ্র হইতে পারে না। অপৌরুষেয়ের অর্থটা অমন করিয়া খাটাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুধীজন অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির সহিত মিলাইয়া ইহার অন্য অর্থও করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। কিন্তু এখনও যাঁহারা চাঁদে বুড়ীর চরকা কাটায়, কি সাপের মাথায় ধরিত্রীর অবস্থানে অটল বিশ্বাস রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। কেহ হয়ত মনে করিবেন এমন সাদা কথা লইয়া এত কালি কলমের খরচ কেন! আমরাও বলি ঐটাই ত ক্ষোভ!

(২)

অনেকে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারেন,—বেদ ত কেতাব নয়, বেদ হইল জ্ঞান। কেতাব পরে হইয়াছে এবং সেটা অবশ্যই মানুষের লেখা। এবং জ্ঞানকে অপৌরুষেয় বলা চলে। বেশ, কিন্তু এই জ্ঞান মানুষের ভিতর গজাইল কেমন করিয়া? শাস্ত্রান্তরে আছে, মানুষ যেমনই জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলটি ভক্ষণ করিল, অমনি তাহার মনে জ্ঞানের বেদনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এ জ্ঞান বোধ হয় বৈদিক জ্ঞান নয়। কারণ এ জ্ঞানে হইল মানুষের পতন, বৈদিক জ্ঞানে হইল মানুষের উন্নয়ন। পতনই হো'ক, আর উন্নয়নই হো'ক এই বিভিন্ন জ্ঞানগুলো কি তড়িদ্বিকাশের মত সহসা মানুষের অন্তরে ঢুকিয়াছিল? এবং সে গুলো কি একেবারে পূর্ণ শাস্ত্রের আকার ধরিয়া মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল? যদি তাহাই হয়, তবু সে শাস্ত্র বুঝিয়াছিল কে? অবশ্যই মানুষের মন। তাহা হইলেই শাস্ত্র আসার আগেই

মানুষের মনের সৃষ্টি মানিতেই হইবে। আর মনের সঙ্গে মনের পূর্ণ স্বাধীনতা তখন ত থাকিবেই। অতএব যে ভাবেই হো'ক মানুষের স্বাধীন মনই শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞান প্রথমেই মানুষের মন গড়িতে বসে নাই।

কিন্তু জ্ঞানের আগমন সম্বন্ধে কথাটা এখনও ঘোলাটে রহিয়াছে। সত্যই কি মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য মনে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়া উদিত হইয়াছিল। মানুষের মনটা কি জহ্নু মুনির মত সমগ্র জ্ঞান-মন্দাকিনী এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিল? জহ্নু-মুনির গঙ্গা গলাধঃকরণের গল্পটা অবশ্যই পৌরাণিক, প্রামাণিক নয়। এমন করিয়া মনুষ্য-মনের জ্ঞান লাভের মতটাকেও পুরাণের কোঠাতেই ফেলা চলে, কিন্তু প্রমাণের কাছ ঘেঁসিয়াও আনা যায় না। কারণ এটাও নিতান্ত আজগুবি ও গাজুরি বলিয়াই ঠেকে। মানুষের বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাস ইহার পক্ষে কোনই সাক্ষ্য দেয় না। সমগ্র জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, একটি বিশেষ জ্ঞানও মানুষ বহু সাধনার পরই লাভ করে। এ সত্যের কোন একটা বিশেষ উদাহরণ দিবার দরকারই নাই, ইহা মানুষের জীবনে নিয়তই ঘটিতেছে। শুধু ব্যষ্টি জীবনেই নয়, সমষ্ঠি জীবনেও। কত ব্যক্তি-পরম্পরার সাধনার ফলে তবে একটি জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। কত পুরুষ-পরম্পরার চেষ্টায় তবে একটি জাতীয় সংস্কার গড়িয়া ওঠে। তবে কেমন করিয়া বলিব মানব সৃষ্টির আদিতে সমস্ত জ্ঞানগুলো এখনকার কল-টেপা বৈদ্যুতিক আলোর মত—মানুষের মনে একেবারে এক চোটে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! মানুষের আর যাহাই বদলাক, তাহার প্রকৃতিটা ডিগবাজি খাওয়ার মত কখনই উলটাইতে পারে না।

মানব মনে জ্ঞান কখনো এমন করিয়া একেবারে আসে নাই আর সেটা কোন যুগেই নিঃশেষে আসিবার জিনিসও নয়। জ্ঞানের একেবারে আসাটা অনেকের কাছে অসম্ভব ঠেকিলেও, তাহার নিঃশেষে আসাটা তাঁহারা আবার অসম্ভব রকমই বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ভগবান কোন অজ্ঞাত অতীতেই তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের যাহা কিছু সব মানুষকে দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি যেন সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত। অতীতের প্রতি একটা একান্ত ভক্তি ছাড়া এই ধারণার কি অন্য কোন ভিত্তি আছে? অতীতের প্রতি ভক্তি অবশ্যই ভাল জিনিস, কিন্তু সেটাকে এমন গরহিসেবী খেয়ালে বাড়াইয়া তোলা নিশ্চয়ই ভাল জিনিস নয়। ভারতের বেদ গড়িতে কোন কাল্পনিক অতীতে ভগবানের জ্ঞান-ভাণ্ডারটা সব উজাড় হইয়া গেল, এরূপ ধারণায় বেদের গৌরব বাড়ে কি না সন্দেহ, জ্ঞানের গৌরব ত নিশ্চয়ই বাড়ে না। গোটা কত খণ্ড আলোক—তাহার সংখ্যাও যতই কেন হোক না—সূর্য্যের জ্যোতির কাছে যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, এটা কে না স্বীকার করিবে? একটি পরিমিত জ্ঞানকে আত্মস্থ করা অপেক্ষা কি অনন্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়া বেশী গৌরব নয়?

কি প্রাকৃতিক জ্ঞান, কি অধ্যাত্ম জ্ঞান, কোন জ্ঞানই কোন দেশ কাল পাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। দুয়েরই ক্রমবিকাশ আছে, ক্রমোন্নতি আছে। তবে দুয়ের বিকাশ ও উন্নতি অবশ্যই সব সময়ে ও সব যায়গায় সমান বেগে চলিতে থাকে না। কোন একটি বিশেষ যুগে বা বিশেষ স্থলে এই দুয়ের কোন একটির বিশেষ উন্মেষ যে ঘটে, এ কথা অবশ্যই মানি। কিন্তু সেই বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ উন্মেষের সঙ্গে তাহা যে একেবারে শেষ হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই মানিবার মত

নয়। ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম জ্ঞানের দেশ, য়ুরোপ প্রাকৃত জ্ঞানের কেন্দ্র অথবা অতীতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের চর্চ্চা বেশী হইয়াছিল, এখন প্রাকৃতিক জ্ঞানের উপরেই মানুষের বেশী ঝোঁক—এ রকম তর্ক কতকটা হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক জ্ঞানটা য়ুরোপ একেবারে বিশ্বের ভাণ্ডার ঝাড়িয়া আনিয়াছে, বলা যদি নিতান্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হয়, তবে অতীত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপর সর্ব্বগ্রাসী দাবিটাকেই বা কেমন করিয়া নিতান্ত সম্ভব ও স্বাভাবিক রকমে খাড়া করা যায়?

(৩)

এখন তর্ক উঠিতে পারে, সকল জ্ঞানই কি তবে অনুশীলন-সাপেক্ষ? তাহাই যদি হয়, তবে মহাপুরুষদের বিশেষত্ব কি? তাঁহারা ত আর বহু গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন নাই। দেশের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানগুলো ঘষা মাজা করাই ত তাঁহাদের জীবনের কাজ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন মহাগিরির অভ্রভেদী চূড়ার মত। স্বর্গের নবতর কল্যাণতর আলোকেই তাঁহাদের ললাটদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্তের বহু আয়াসপুষ্ট ঝাড়লণ্ঠনের বাতিতে নয়। তাঁহারা ধূলা কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জ্ঞানরত্নের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করেন নাই, আকাশ হইতে অজস্রধারে এই রত্নবৃষ্টি তাঁহাদের চারিধারে পড়িয়াছিল। অনুশীলনের অবিরাম আঘাতে তাঁহারা জ্ঞান-মন্দিরের দরজাটা একটু একটু করিয়া খোলেন নাই, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই সরিয়াছিল—তাঁহাদের যোগমন্ত্রের প্রভাবে। যোগী না হইয়াও

যোগ মানি, এবং যোগের এই মাহাত্ম্যেও অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মহাপুরুষ বা যোগী যে একটা নিতান্ত অসম্ভব রকম আকাশকুসুম জাতীয় জিনিস এটা কখনই মনে হয় না। মহাপুরুষকে যদি ধবলগিরি বলি, তবে তাঁহার সমসাময়িক মানবসমষ্টিকে হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিব—পুরাণের পাখাওয়ালা মৈনাকের সঙ্গে যাঁহারা তাঁহাকে সমশ্রেণী করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। পাহাড়ের সঙ্গে পাহাড়ের শৃঙ্গের একাত্মতা উড়াইয়া দিলে একটা কাল্পনিক খেয়ালই সৃষ্ট হয়, সেটা আর সত্যকার জিনিস থাকে না। মহাপুরুষ-মহীরুহের মাথাটা আকাশ স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহার শিকড়টা থাকে মাটির ভিতরেই। তাহার পত্রের মুখ স্বর্গের বাতাস হইতে অনেক পুষ্টিকর খাদ্য পায় বটে কিন্তু মাটির রসে তাহার বড় কম বর্দ্ধন করে না। কৃষ্ণ বা যীশু জুলু বা কাফ্রীর মধ্যে জন্মান নাই। মহাপুরুষ তাঁহার দেশকে উচ্চে তোলেন সত্য কিন্তু তাঁহার নিজের দেশই আবার তাঁহার উচ্চতা পরিমিত করে। আর পৃথিবীতে ধবলগিরি যেমন একমাত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ নয়, তেমনই কোন বিশেষ দেশের মহাপুরুষের মধ্যেই মহাপুরুষত্বের খতম হয় না। মহাপুরুষের আবির্ভাব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল কালেই ঘটিতে পারে। সেই আবির্ভাবের সঙ্গে কত শাস্ত্রমতেরও বিবর্ত্তনের ও বিসর্জ্জনের সম্ভাবনা।

জ্ঞানীই বল, আর যোগীই বল, সকলেই নিজ নিজ সমাজ-ক্ষেত্রেই ফুটিয়া ওঠেন, আকাশকুসুমের পর্য্যায়ে কাহাকেও ফেলা চলে না। ইঁহারা নব নব জ্ঞানের সৌরভে ধরিত্রী বক্ষ আমোদিত করেন বটে, কিন্তু সে সৌরভের সম্পর্ক শুধু নন্দনের পারিজাতের সঙ্গেই নয়

ক্রমিক অনুশীলনে দেশের মধ্যে যে জ্ঞানের আবাদ হইয়াছিল, তাহার গন্ধও সেই মর্ত্ত্যের পুষ্পের সৌরভে বহুল পরিমাণে সৌরভিত। ফল কথা, জ্ঞানের আবির্ভাবের মধ্যে কখনবা একটি আকস্মিক দৈব ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ক্রমবিকাশের পদ্ধতিটা সেই সঙ্গে না মানিবার জো নাই। জ্ঞানের এই দৈব ও মর্ত্ত্য বিকাশ এক বিশেষ দেশ কাল পাত্রের বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ধরাবক্ষে মানুষের স্থিতি যতদিন, ততদিনই ইহার প্রক্রিয়া সর্ব্বত্র চলিতে থাকিবে। এই বিকাশ-ক্রিয়ার মূলে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা চিরদিনই বিদ্যমান, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ বিকাশ স্থবিরত্বে সম্ভবে না, ইচ্ছার গতিশীলতা হইতেই যে ইহার উদ্ভব।

(৪)

তবে স্বাধীন মতের নাম শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি কেন? পুরাতন বন্ধনের অচলতার মধ্যে মানুষ বেশ একটা আরাম পায়। নূতনকে মানুষ স্বভাবত একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে। যাহার সঙ্গে বহুদিন ঘরকন্না করিয়াছি, তাহাকে মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে পারে, একজন নূতন অতিথিকে ততটা বিশ্বাস করিতে চায় না। পুরাতন কতকটা নিশ্চিত, ইহার মধ্যে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততা আছেই। আবার নূতনের সঙ্গে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কা জড়ানো। তাই নূতন অনেকেরই দু-চক্ষের বিষ। নূতনকে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তাহাকে পরখ করিবার ইচ্ছাটাই অনেকে দাবিয়া রাখে। তাহা হইলেও এমন সময় আসে যখন ঐ পুরাতন নিশ্চিন্ত শান্তিটিই মানুষের মনের উপর একটা বোঝার মত হইয়া দাঁড়ায়! সে তখন

একটু চিন্তা করিবার স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হয়। শেষে সে বুঝিতে পারে, যাহাকে সে বিষ বলিয়া ভাবিয়াছে তাহারই মধ্যে অমৃতরূপে তাহার নব জীবনের বীজই বিদ্যমান।

নূতন মাত্রকেই আমরা অশুভ মনে করিব কেন? আর এই নূতনের জননী যে মানব-মনের স্বাধীনতা, তাহাকেই বা শত্রু বলিয়া ভাবিব কেন? যদি শত্রুর কথাই তোল, তবে দেখিবে নূতন পুরাতন উভয়ের মধ্যে সে ওৎ পাতিয়া থাকিতে পারে। পুরাতনের বন্ধনে কিছু না কিছু জড়ত্বের জাল রচনা করে আবার নূতন স্বাধীনতার মধ্যেও কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবার সম্ভাবনা। অবিমিশ্র মঙ্গল কোনটাই নয় অথচ দুই-ই আমাদের চাই।

যখন দুই-ই আমাদের দরকার তখন উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিতেই হয়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য করার ভার ত আর পুরাতন শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপানো যায় না। পুরাতন শাস্ত্র নিজে ত এখন কতকগুলো কালির আঁচড় মাত্র, তা সেটা ভূর্জ্জপত্রেই থাকুক, আর ফুলিস্কেপেই পড়ুক। এই কালির আঁচড়ের সঙ্গে যখন আমাদের জ্ঞানের সংযোগ ঘটে, তখনই না তাঁহার গৌরব আমরা বুঝ্‌তে পারি। আর স্বাধীনতা জিনিসটি কি, তাহাত আমরা নিজেদের জীবনে পদে পদে বুঝিতেছি। মানুষ যখন শাস্ত্র ও স্বাধীনতা দুই-ই বোঝে, তখন মানুষের পক্ষে উভয়ের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা অসম্ভব নয়। অসম্ভব ত নয়-ই, বরং মানুষ এরূপ একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা নূতনের প্রচারক তাঁহারা ত একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টায় ফিরিবেন-ই, কিন্তু পুরাতনের উপাসকেরা-ই কি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন?

কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালীর মতই ঠেকে। নিরেট শাস্ত্রাধীনতার মধ্যে আবার সামঞ্জস্যের স্থান কোথায়! সামঞ্জস্য ত নূতনকে লইয়া, এই নূতনকে আমল দিলেই যাঁহাদের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে, তাঁহাদের সামঞ্জস্যে প্রয়োজন কি? তাঁহাদের ধর্ম্মে ইহার প্রয়োজন না থাকুক, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম অনেক সময় এই প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। শাস্ত্র না বদলাক, সময় যে বদলায়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। আবার অবস্থার অনুযায়ী একটু ব্যবস্থার বদল না করিলেই বা চলে কৈ? হাজার বৎসরের বিধিগুলো এখনকার অবস্থার সঙ্গে কি ষোল আনা খাপ খাওয়ান যায়? তাই অবস্থার গতিকে শাস্ত্রপন্থীরও পক্ষে সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক পুরাতনের সঙ্গে এই নূতনের একটু সমন্বয় করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তবে তাঁহার সমন্বয়টা চলে একটু বেনামি রকমে। পুরাতনের সঙ্গে নূতন বিধির সংযোগ করা তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম হইলেও, পুরাতনকে মাজিয়া ঘষিয়া একটা নূতন জলুস দিতে তিনি পিছ পা হন না। তাঁহার শাস্ত্রের অক্ষরগুলো যেমন, তেমনই থাকে বটে, কিন্তু তাহার অর্থটি, তাঁহার ব্যাখ্যা, ভাষ্য টীকা টিপ্পনির মুখে বেশ একটু ওলট পালট খায়। তবে এই চেষ্টা অনেক সময় সম্যক ফলবতী হয় না। অবস্থার একটু আধটু অদল বদলে এটুকুতে কিছু কাজ দেখিতে পারে কিন্তু অবস্থাটা যখন কালপ্রভাবে বড় বেশী ফারাক হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর ঐ বেনামি সমন্বয়ের ছিটে-ফোটায় কিছুই শানায় না।

(৫)

যাঁহারা স্বাধীনতার প্রচারক, শাস্ত্রপন্থীরা তাঁহাদের উপর বড় সদয় নহেন। ইঁহাদের উক্তিগুলো শাস্ত্রপন্থীরা অনেক সময় নিজেদের সুবিধা মত বেশ একটু একপেশে রকমেই ব্যাখ্যা করেন। ইঁহাদের কথার অ-বিভক্ত ভাবটা না বুঝিয়া তাহার বিভক্ত শব্দগুলোই যেন বেশী নাড়াচাড়া করা হয়। তাই অনেক সময় এই সব আলোচনার মধ্যে ব্যখ্যাতার উপলব্ধি অপেক্ষা যেন আক্রোশই বেশী প্রকাশ পায়। শাস্ত্রপন্থীদের শাস্ত্রের স্থান বুঝি স্বয়ং ভগবানের চেয়েও উচ্চে। শাস্ত্রের উপর কোন রকম একটু মৃদু আলোচনার আঁচও ইঁহারা সহ্য করিতে অপারগ। কাহারও ভাবভঙ্গীতে শাস্ত্রের প্রতি একটু অ-বশ্যতা দেখিলেই তাঁহারা বেজায় খাপ্পা হইয়া পড়েন। এই অ-বশ্যতার কারণটা কি এবং সেটা বাস্তবিক বিবেচ্য কি না, এ সব দেখিবার তাঁহাদের অবসরই থাকে না। তাই তাঁহাদের পাল্টা জবাবে যুক্তি ততটা থাকে না, যতটা থাকে হয় ভাবের ফোয়ারা, নয় গালি-গলাজের নর্দ্দামা। এই ফোয়ারা বা নর্দ্দামার বেগ কোন সমাজকে ক্ষণিক টানিয়া লইয়া যাইতে পারে কিন্তু সে খুব বেশী দূর নয়। কারণ শাস্ত্র-গৌরবের যে একটু অংশ তাঁহারা নষ্ট করিতে বসিয়াছে মনে করেন তাহার পুনরুদ্ধারের যথার্থ পথ ত আর ইহাতে একটুও বাড়ে না বরং ক্রমে মরিয়াই আসে।

শাস্ত্রপন্থীদের অভিধানে স্বাধীনতা মানে—একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। শাস্ত্রের প্রতি অ-বশ্যতার হ্রাস মানে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র, রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি একেবারে সবগুলো সাপ্‌টাইয়া অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন। স্বাধীনতা জিনিসটা কি বাস্তবিক এমনই বিকট! যখন

আমাদের আত্মাপুরুষ কোন একটা জড়ত্ব বা দাসত্বের বন্ধন ছিঁড়িতে উদ্যত, তখন তাহার সেই উদ্যমটায় অল্পাধিক একটা বিপ্লবের ভাব থাকিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু সেইটাই ত আর স্বাধীনতার চিরন্তন মূর্ত্তি নয়। যে শাস্ত্রটা বর্ত্তমানে মানবাত্মার প্রসারণে অন্তরায় ঘটায়, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেটাকে না ছাঁটিয়া থাকিতে পারে না কিন্তু তাহা বলিয়াই আমরা অতীত হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাকে নির্ম্মূলে ধ্বংস করাই স্বাধীনতার কাজ নয়। যদি কখন কোন স্বাধীনতা এমন প্রলয়ের আকারে দেখা দেয়, তবে তাহারও বিলয় অচিরেই ঘটে। এবং আবার সেই মৃত্যুঞ্জয় অবিনাশী অতীত নূতন কল্যাণের রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

স্বাধীনতার কাজ শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করা নয়, শাস্ত্রকে আত্মস্থ করা। শাস্ত্র যখন আমার জ্ঞানের ভিতর থাকে না, থাকে শুধু কেতাবের অক্ষরে, দশের কথায় ও দেশের প্রথায় তখন তাহা আমার মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও যথার্থ আমার জিনিস হয় না। যখন তাহাকে আমি আমার নিজের সাধনা ও উপলব্ধির মধ্যে লাভ করি, তখনই সে আমার হয়। স্বাধীনতা শাস্ত্রকে বাদ দিতে চায় না, কথা ও প্রথা বহুকাল ধরিয়া তাহার উপর যে একটি পুরু জাল বুনিয়াছে, সেইটাকে সরাইয়া তাহার আসল মূর্ত্তিটি দেখিতে চায়। এই দেখিবার ফলে তাহাতে যদি কোন অমঙ্গল বা অসঙ্গতির লক্ষণ ধরা পড়ে স্বাধীনতা তখনই তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে কোমর বাঁধে, নহিলে শাস্ত্র দেখিলেই তাহার মাথায় মুগুর মারা, স্বাধীনতার এমন ডাকাতী পেশা নয়।

এমন যথেচ্ছ ভাবে মুগুর মারিতে গেলে সে আঘাত কি আমাদের স্বাধীন জ্ঞানের নিজের গায়েও কতকটা পড়ে না? আমাদের স্বাধীন

জ্ঞানের ভিতরে কি পূর্ব্বসঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞান নিহিত নাই? অতীতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে বাদ দিলে মানবের স্বাধীন জ্ঞানের আর থাকে কি? সেটা ত তখন আদি মানবের একটা অপরিস্ফুট আবছায়া রকমের সংস্কারে পরিণত হয়। তাহার পরিধি অতি ক্ষুদ্র, তাহার চিন্তাশক্তি অতি তুচ্ছ। ক্রমশঃ বিকসিত, বিবর্দ্ধিত ও সঞ্চিত জ্ঞানের সাহচর্য্যেই না সেই স্বাধীন জ্ঞান আজ এমন পরিপুষ্ট। যে জাতির মধ্যে সমষ্ঠিগত জ্ঞান বর্দ্ধিত ও সঞ্চিত হয় নাই, তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন জ্ঞানও অতি অপরিণত। পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান-সমষ্ঠি দ্বারাই আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের উৎকর্ষ পরিমিত হয়। তবে স্বাধীন জ্ঞানকে একটা উদ্ভট কিছু বলিয়া আমাদের মনে করিবার কি কারণ আছে? আমাদের স্বাধীন জ্ঞান ত আর পূর্ব্ব-লব্ধ শাস্ত্র জ্ঞানের একান্ত সম্পর্ক বিরহিত একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস নয়।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা দিলেও, বাস্তবিক তাহারা উভয়ে উভয়ের শত্রু নয়। তাহারা পরস্পরের পরিপোষণই করিয়া থাকে। এই পরিপোষণের পথ খোলসা থাকিলে, বিরোধের ভাব কখনই থাকিতে পারে না। আমাদের এই কথা হইতে বোধহয় কেহই এমন বুঝিবেন না যে আমরা স্বাধীন মত মাত্রকেই বরণ করিয়া লইতে বলিতেছি, মানবের কল্যাণের জন্য যেমন শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার, তেমনই তাহার কল্যাণের জন্যই স্বাধীন জ্ঞানের দাবিটাও অগ্রাহ্য নয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

পয়ার।

—:*:—

কবিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সু-করকমলেষু—

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন "বিচিত্রায়" যখন ছন্দের আলোচনা হয়, তখন সে আলোচনায় যে আমি যোগদান করি নি, তার প্রথম কারণ—সভার একটেরে বসেছিলুম বলে', আপনার বক্তব্য সকল কথা আমার কর্ণগোচর হয় নি, এবং তার দ্বিতীয় কারণ ওবিচারে আমি অনধিকারী। এ কথা আমি বিনয় করে বল্‌ছি নে। এ বিষয়ে আমার শক্তির অভাবের পরিচয় আমি আটের অপর একটি ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব্বে লাভ করি। আমার তালজ্ঞান যদি সহজ হ'ত, তাহ'লে আমি একজন চলনসই গাইয়ে হ'তে পারতুম; কেননা আমি তাল-কাণা হ'লেও সুর-কালা নই,—এবং সুর ভগবান শুধু আমার কানে নয় কণ্ঠেও দিয়েছিলেন। আমার এমন একদিন গিয়েছে যখন, আমি আর সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে গান অভ্যাস করবার চেষ্টা করেছি এবং সে চেষ্টার ফলে সুরকে কায়দা করে আন্‌তে অল্প-বিস্তর কৃতকার্য্যও হয়েছিলুম। কিন্তু একদিন আমার একটি পাখোয়াজি বন্ধু আমাকে 'বেতাল সিদ্ধ গায়ক' বলাতে চিরদিনের মত সঙ্গীতের চর্চ্চা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই। অতএব এ কথা স্বীকার

করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ছন্দ সম্বন্ধে আমার অশিক্ষিত কিম্বা শিক্ষিত কোনরূপ পটুত্ব নেই। কবিতা আমি ছন্দের দিকে নজর রেখে পড়ি নে। তবে এমন সব কবি আছেন, যাঁদের কবিতার ছন্দ অতিশয় অন্যমনস্ক লোকেরও চোখ এড়িয়ে যায় না—যথা ভারতচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এঁদের লেখা পড়েই কবিতায় ছন্দের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার চোখ ফুটেছে।

এ অবস্থায় আপনার অনুরোধে আমি কেন যে অনধিকার চর্চ্চা করতে উদ্যত হয়েছি তারও কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। সেদিনকার সভায় আমার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও ভদ্রলোক আমার মৌনতা, আপনাদের মতের সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেন্ নি। তিনি বলেন যে, আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত বলে ওক্ষেত্রে নীরব ছিলুম। এ কথা বলার অর্থ এই যে, যার বিষয়ে দুটো ভাল কথা বল্‌বার নেই তার বিষয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, তবে বাংলার ঐ দুই মামুলি ছন্দের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, এ কথা আমি বিনা ওজরে স্বীকার করে নিতে পারি নে। সুতরাং আমি এই সুযোগে পয়ার ত্রিপদীর পক্ষ থেকে একটু ওকালতী করতে চাই। বলা বাহুল্য ছন্দ সম্বন্ধে আমি যা বল্‌ব সে উপরচাল হিসেবে গণ্য করতে হবে—অর্থাৎ তা গ্রাহ্য করা আর না করা সম্পূর্ণ খেলোয়াড়দের হাত।

আমি পয়ার ত্রিপদীর বিরোধী নই, কেননা আমি কোনও ছন্দেরই বিরোধী নই। সকল ছন্দেরই এক একটা বিশেষ মূল্য, বিশেষ মর্য্যাদা ও বিশেষ সার্থকতা আছে। আমি কোনও art-formকেই অবজ্ঞা করিনে; এবং প্রতিটিকেই আর্টের রাজ্যের চিরস্থায়ী

সম্পদ বলে মনে করি। শুনতে পাই এই জড়জগতের শক্তি ও পরমাণুর পুঁজি বাড়েও না কমেও না, প্রকৃতির ও মূলধন অনাদি ও অনন্ত। চোখের সুমুখে আমরা যে হ্রাস বৃদ্ধি দেখতে পাই তার কারণ বিশ্বের একদিকে যেমন শিকস্তি হয় আর একদিকে তেমনি পয়স্তি হয়। এর এক অংশে যখন কিছু যোগ হয়, তখন বুঝতে হবে আর এক অংশে ঠিক ততখানি বিয়োগ হয়েছে। সমগ্রটার পরিমাণ ও ওজন চিরকালই সমান থেকে যায়। কিন্তু মনোজগতের হিসেবটা এর ঠিক উল্টো। জড়জগৎটা আমাদের পড়ে পাওয়া আর মনোজগৎটা আমাদের হাতে গড়া। সে জগৎটা শুধু বেড়েই চলেছে আর সে যোগের গুণে। মানুষের জ্ঞানের সম্বল, চিন্তার ধারা, অনুভূতির প্রসার যে যুগের পর যুগে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। তার কারণ এক যুগের মনের ধনের সঙ্গে আর এক যুগের মনের ধনের যোগ হচ্ছে। এস্থলে অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বচিন্তা কি সব বজায় থাকে, না ও সব বস্তু ক্রমান্বয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং নূতন জ্ঞান নূতন চিন্তা পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করছে? এর উত্তরে আমি বলি—পুরাতনই নূতনের জন্মদাতা; সুতরাং তার যা যথার্থ সম্পদ নূতন তা উত্তরাধিকারী সত্ত্বে লাভ করে। নূতন কতক পরিমাণ পুরাতনেরই জের টেনে চলে—এ সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মমত নীতিমত প্রভৃতি কখনও স্ব-রূপে চিরস্থায়ী হতে পারে না, এ সবারই অস্তিত্ব কালের অধীন। একমাত্র আর্টই কালের অধীন নয়। যাকে আমরা আর্ট বলি তা আপাদ-মস্তক একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি বলে তা আর হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন নয়। Venus de

Milo, তাজমহল, শকুন্তলা ও হ্যামলেট প্রভৃতি প্রতিটি একটি সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মানসী সৃষ্টি, ওর উপর আর মানুষের খোদকারি চলে না। মানুষে নূতন সৃষ্টি যে করতে পারে শুধু তাই নয়—সে যদি প্রাণে নয় মনেও বেঁচে থাকতে চায়, তাহ'লে মনের দেশে সে নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু যা আর্ট তা মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। A thing of beauty is a joy for ever—এ কথা যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য।

মানুষে যে শুধু আর্ট সৃষ্টি করে তাই নয়—সেই সঙ্গে কতকগুলি art-form-ও সৃষ্টি করে। এবং আর্টের মত এই আর্ট-ফরমগুলোও—মানুষের চির-সম্পদ। এই সব চিরাগত art-form-কে সানন্দে বরণ করে নেওয়ায় মানুষে আত্মার দৈন্য নয়—শক্তিরই পরিচয় দেয়। মানুষে যাকে ভাষা বলে সেও একটি art-form ছাড়া আর কিছুই নয়, আত্ম-প্রকাশের একটি বিশিষ্ট উপায়। এই ভাষার ছাঁচে নিজের মন ঢালাই করতে কোনও কবি অদ্যাবধি আপত্তিও করেন নি, ব্যাথাও বোধ করেন নি। এ ছাঁচ একটি প্রকাণ্ড ছাঁচ বলে লোকে এটিকে ছাঁচ বলে চিন্‌তেই পারে না, অথচ ভাষা ভাবের ছাঁচ বই আর কিছুই নয়। তর্ক অবশ্য ওঠে ছোটখাটো ছাঁচ নিয়ে—যেমন গ্রীসের নাটকের ছাঁচ, আমাদের দেশের রাগরাগিণীর ছাঁচ, আর সকল দেশের কবিতার ছন্দের ছাঁচ। এই সব সঙ্কীর্ণ ছাঁচ যে গুণী লোকের প্রতিভাকে চেপে মারে নি—তার প্রমাণ Æschylus, Sophocles Euripides প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বাগ্রগণ্য নাটককারেরাও ঐ একই ছাঁচে তাঁদের সকল মন, সকল প্রাণ, সকল জ্ঞান, সকল ধ্যান ঢেলে দিয়ে এক একটি অপূর্ব্ব সুন্দর-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, অথচ এঁদের একের প্রতিভা অপরের

প্রতিভার স্বজাতি নয়। Æschylus-এর সঙ্গে Euripides-এর তফাৎটা কতদূর তার পরিচয় Aristophanes-এর Frogs-এ পাবেন। এঁদের জ্যেষ্ঠটি দক্ষিণ মার্গের, কনিষ্ঠটি বাম মার্গের এবং মধ্যমটি মধ্যপথের চরম কবি। ভরসা করে চরম কবি বলছি এই জন্যে, যে অনুবাদে যাঁদের রচনা এত চমৎকার, তাঁদের মূল রচনার সৌন্দর্য্যের নিশ্চয়ই আর তুলনা নেই।

এই লম্বা ভূমিকাই প্রমাণ যে, এক্ষেত্রে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত হতে পিছ-পা হচ্ছি, কারণ ছন্দের উপর হস্তক্ষেপ করতে আমি স্বতঃই নারাজ। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়মকে আমি কবিতা রচনার শত্রু নয়—মিত্র হিসেবেই গণ্য করি। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার মত দু'ছত্রে প্রকাশ করেছি। আমি লিখেছি—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহা মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

একথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার মনের কথা, আমার সনেটের অন্তরে যে মুক্তি নয়—সুপ্তি লাভ করেছে, তার কারণ আমি ছন্দ-শিল্পী নই। আপনার হাতে ঐ একই জিনিস চতুর্দ্দশ-দল ফুলের মত ফুটে উঠত। পয়ার ত্রিপদী যে ছন্দশিল্পীদের তেমন প্রিয় নয়—তার কারণ এদের বন্ধন কড়া নয়—ঢিলে। এক হিসেবে এ দুই verse-form-এর ঐ সহজ ঢিলেঢালা ভাবটা দোষেরও বটে গুণেরও বটে। আনাড়ির হাতে এ দুই-ই যেমন অচল, গুণীর হাতে আবার তা তেমনি সচল। কেন তা পরে বলছি।

(২)

পয়ার বাংলা কাব্যের শুধু বাঁধা সড়ক নয়—একেবারে বড় রাস্তা, সাধুভাষায় যাকে বলে রাজ-পথ। কাব্যের এ রকম রাজ-পথ সকল ভাষাতেই আছে। গ্রীকের Hexametre, সংস্কৃতের অনুষ্টুপ, ফরাসীর Alexandrine, ইংরাজির Iambic-pentametre-এ—সবই হচ্ছে পয়ারের স্বজাতি। এক আধ মাত্রার কমবেশিতে কিছু যায় আসে না—এ সব ছন্দের ভিতর একটা মস্ত বড় মিল আছে। এ সব ছন্দই চরণে চরণ মিলিয়ে চলে এবং এদের প্রত্যেকের প্রতি চরণটি কিঞ্চিৎ লম্বা। এর একটি কারণ এ সব ছন্দের জন্ম গদ্যের জন্মের বহুপূর্ব্বে হয়েছিল। সভ্যতার আদিযুগে এই শ্রেণীর পদ্যই ছিল মানুষের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়। এরি সাহায্যে মানুষকে গল্প বল্‌তে হ'ত, জ্ঞান বিতরণ কর্‌তে হ'ত, রাগ বিরাগ প্রকাশ কর্‌তে হ'ত। কিন্তু এ সব ছন্দ হচ্ছে প্রধানত আখ্যায়িকারই বাহন। একটানা একটা লম্বা গল্প বলে যাবার জন্য এই হচ্ছে কাব্যের সনাতন পথ। এ সব ছন্দে মানুষের মন চল্‌তে পারে, এমন কি ছুট্‌তেও পারে কিন্তু নাচ্‌তে পারে না, অন্তত সহজে ত নয়-ই। ভাবের এ বাহনের যে শুধু পিঠ চৌড়া তা নয়—এর গতিও ধীর, ললিত। এ ছন্দের ভিতর space এবং repose দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই কারণে অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল দেশেই কবিরা ভাবের দীর্ঘযাত্রা কর্‌তে হলে ঐ প্রশস্ত পথই অবলম্বন করেন। এ সব ছন্দের তাল হচ্ছে চৌতাল ধামারের ঘরের। পয়ারের তাল ঢিমে বলে আনাড়ির হাতে তা প্রায় গদ্য হয়ে যায়—অপরপক্ষে গুণীর হাতে তার ধ্বনি মৃদঙ্গের পরং-এর মত জমাট ও

ভরাট হয়ে ওঠে। উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত। এ পয়ার কালিদাসের মন্দাকান্তার অনুরণনে ভরপুর। এ ছন্দ ইচ্ছামত দ্রুত ও বিলম্বিত করা যায়—অবশ্য এর অবিরল ঘন ভাবটি বজায় রেখে, নচেৎ এর স্ব-রূপটি বজায় থাকে না। এই কারণে যদিচ ভাবপ্রকাশের একটি নতুন ও সোজা পথ—গদ্য বেরিয়েছে তবুও কাব্যের এই আদি ছন্দ আজও সশরীরে বর্ত্তমান হয়েছে। গদ্যেরও অবশ্য rhythm আছে কিন্তু metre নেই। এই metre-এর অভাবেই গদ্য এশ্রেণীর পদ্যের মত সাকার হয়ে উঠ্‌তে পারে না এবং art হিসেবে সেইজন্য গদ্যের স্থান আজও পদ্যের নীচে। আমি পূর্ব্বে বলেছি পয়ার প্রভৃতি চৌতাল ধামারের ঘরের তাল। ও তালে ভাষাকে নাচান যায় না—কিন্তু ঐ তালকে আড়্ করে নিলে, ভেঙ্গে নিলে—যৎ খেমটা সবই পাওয়া যায়। সুতরাং পয়ার প্রভৃতি ছন্দ যেমন metre-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে একদিকে গদ্যে পরিণত হয়েছে অপর দিকে তেমনি metre-এর ভাঙ্গচুরে নানা ছন্দে পরিণত হয়েছে। সকল ছন্দের কুলের খবর আমি জানিনে কিন্তু পয়ার ত্রিপদী ভেঙ্গে ও আড় করে যে নানা ছন্দ গড়া যায় তার পরিচয় ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব দাঁড়াল এই যে, পয়ার ত্রিপদী যে নিজগুণে বেঁচে আছে—তাই নয়, ঐ মূল ছন্দ থেকে নানা ছন্দের উদ্ভবও হয়েছে। আমার একথা যদি সত্য হয়, তাহলে পয়ার ত্রিপদীকে কাব্যরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে দেবার দিন আজও আসে নি। ভবিষ্যতে কি হয় তা বলা যায় না।

(৩)

কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার এ ওকালতিটে একদম বাজে খাটুনি হয়েছে।—আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, পয়ার ত্রিপদীকে মানে মানে বিদায় দেবার কথা কেউ মুখে আনা দূরে থাক্‌ মনেও আনেন্‌ নি। শুনছি, তর্ক উঠেছে এই নিয়ে যে, চল্‌তি বাংলা কথাকে পয়ারের ভিতর খাপ খাওয়ানো যায় কি না। এর জবাব দিতে হলে পয়ারের শুধু চরিত্র নয় জীবনচরিত ও ঈষৎ আলোচনা করা দরকার।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ জাতের ছন্দ সকল ভাষাতেই আছে এবং সকল ভাষারই সেটি শুধু পুরাতন নয় সনাতন ছন্দ। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এ ছন্দ গড়্‌লে কে? এর উত্তরে অনেকে বল্‌বেন—"জাতীয় প্রতিভা।" আমার মতে ও উত্তর—"জানি না" বলারই সামিল। কেন না জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা যাই বলুন—"জাতীয় প্রতিভা" বলে' কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিভা শুধু দুচার জনের থাকে, এবং জনগণের মধ্যে সকলযুগে সকলদেশে যা পুরো মাত্রায় থাকে তা হচ্ছে প্রতিভা-বিদ্বেষ। জাতীয় নির্ব্বুদ্ধিতাই জাতিকে বিশিষ্টতা দেয়, কেননা প্রতি জাতের একটা বিশেষ রকম নির্ব্বুদ্ধিতা আছে। জার্ম্মাণরা যাকে বলে "জাতীয় অহং"—তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জাতীয় অহঙ্কারে। এবং যার জন্য যে জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত, তাই নিয়ে সে জাতি গৌরব করে। এর প্রমাণ এক জাতির হামবড়ামি অন্য জাতির কাছে চির দিনই—যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি বিরক্তিকর। বাল্মীকির মুখে "শ্লোক" যেমন একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি অপর সকল জাতির ভিতরও কোনও না কোনও কবির মুখেই এসব ছন্দ অকস্মাৎ জন্ম লাভ করেছে। এশ্রেণীর ছন্দকে এই হিসাবে জাতীয় ছন্দ বলা যায়

যে এপথ একের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও বহু কবির পায়ে পায়ে তা কাব্যের বড় রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এ সব ছন্দ কেন অপরের কাছে এ ভাবে গ্রাহ্য হয়েছে। এর একমাত্র উত্তর, এ সব ছন্দের জাতীয় ভাষার সঙ্গে ওজনেও পরিমাণে একটা স্বাভাবিক মিল আছে অর্থাৎ ভাষার শব্দরাশি এই সব ছন্দের ভিতর আরামে এবং খাপে খাপে বসে যেতে পারে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বাংলা কথার যে বাংলার পয়ারের ভিতর স্থান হবে না, এ হতেই পারে না। তবে এ রকম সন্দেহ যে লোকের মনে জাগে তার কারণ, আমাদের এ কালের মুখের কথার সঙ্গে সেকালের পদ্যের কথার সম্পূর্ণ মিল নেই। পয়ারের নাম উচ্চারণ কর্‌বামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ান কৃত্তিবাস ও কাশিদাস। আমাদের চল্‌তি ভাষায় হয়ত কাশিদাসী পয়ার লেখা না যেতে পারে কিন্তু তাই বলে পয়ার কেন লেখা যাবে না তা বুঝ্‌তে পারি নে। মুখের কথাকে আমি পয়ারস্থ কর্‌তে পারি নে, কিন্তু আপনি ও রবীন্দ্রনাথ যে ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

পয়ার বল্‌তে আমরা সাধারণ লোকে কি বুঝি? সেই ছন্দ—যার প্রতি পদে চৌদ্দটি করে অক্ষর থাকে। পয়ারের পয়ারত্ব যদি অক্ষরের সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে তাহলে বলা বাহুল্য নানা রকম মাত্রায় ও ছন্দকে চালানো যেতে পারে। শুধু চার মাত্রা নয়, তিন মাত্রা, পাঁচ মাত্রার তালেও পয়ারকে খেলানো যায়। অর্থাৎ আমরা কাওয়ালি ছাড়া—একতালা, ঝাঁপতাল এমন কি যৎও লাগিয়ে দিতে পারি। তা যে পারি তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধে পাবেন। পয়ারের আকার যে অক্ষরগত তার কারণ, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ হয়

দু'অক্ষরের নয় তিন অক্ষরের, বড় জোর চার অক্ষরের, তার বেশি নয়। সুতরাং চৌদ্দ অক্ষরের পদের অভ্যন্তরে আমাদের অধিকাংশ শব্দই অক্লেশে পাশাপাশি বসে যায়।

পয়ারের রূপ যে অক্ষরের উপর নির্ভর করে এ কথা যে সকলে মানেন না, তার কারণ বাংলা শব্দের অক্ষরের আকারের সঙ্গে মাত্রার ওজন মেলে না। বাংলা শব্দের হয় মধ্যে, নয় শেষে হসন্ত থাকায় দুই অক্ষরের শব্দের মাত্রা দেড় এবং তিন অক্ষরের আড়াই। এবং তাল জিনিসটে যখন মাত্রাগত তখন অক্ষর গুণে পয়ার লিখ্‌লে ছন্দ যে বেতালা হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ গরমিল কবির কোনও ক্ষতি করে না। কেননা কবি অক্ষর গুণেও কবিতা লেখেন না, মাত্রা গুণেও নয়। তাঁর রচনা আপনা হতেই ছন্দে পড়ে যায়,— কেননা তিনি যখন কবিতা লেখেন তখন তাঁর কানে—ছন্দের পুরো সুরটা বাজ্‌তে থাকে,—তিনি মাত্রার সঙ্গে মাত্রা জুড়ে পদ্য রচনা করেন না। অর্থাৎ কবির মনপ্রাণ থেকে যা বেরয় তা গোটা ভাবেই বেরয়, আমরা সেই গোটা জিনিসটিকে পরে ভাগ করে তার গড়নের সন্ধান পাই। আর যিনি কবি নন্ অর্থাৎ যাঁর অন্তরে ছন্দ নেই তিনি অক্ষর গুণেই লিখুন আর মাত্রা গুণেই লিখুন— তাঁর হাত থেকে যা বেরবে তার হয়ত তাল পাওয়া যাবে না, আর যদি তাল পাওয়া যায় ত সুর পাওয়া যাবে না। "অন্য লোকে লাঠি বাজে" বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে" না, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারেন্ না। মাত্রার হের-ফের করে কবি ছন্দের সম্পূর্ণতা রক্ষা করেন। মাত্রার কম বেশীর হিসেব তখনই চোখে পড়ে যখন আমরা প্রতি শব্দটিকে আলাদা করে দেখি—কিন্তু একটি পুরো

পদকে একটি ধ্বনি হিসেবে দেখ্‌লে ও জিনিস আমাদের নজরেই পড়ে না।

তারপর আর একটি প্রশ্ন ওঠে। যদি পয়ারকে মাত্রাগত ছন্দ হিসেবে গ্রাহ্য কর্‌তে হয় এবং কাশিদাসী পয়ারকেই আদর্শ পয়ার হিসেবে গণ্য কর্‌তে হয়—তাহলে সে পয়ারের ভিতর মুখের কথাকে বেমালুম খাপ খাওয়ান যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে পয়ারের তাল কাওয়ালি অর্থাৎ চারটি পদে এ ছন্দ সম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, এ ছন্দের ভাগ চারটি হলেও ঝোঁক দুটি মাত্র। সুতরাং একে আট মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ বলা যেতে পারে। হসন্তের গুণে প্রতি বাংলা শব্দের একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে—সুতরাং এ সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়, যে এত ঝোঁকওয়ালা শব্দকে কি করে ঐ দুই ঝোঁকের ছন্দে বসিয়ে দেওয়া যায়। তারা ত প্রত্যেকেই নিজের ঝোঁকে ঠেলে ঠেলে উঠবে এবং এদের কারও ঝোঁক মধ্যে কারও ঝোঁক শেষে।

বাংলা কথার ঝোঁক বেশি আর টান কম; আর সাধুশব্দের টান বেশি ঝোঁক কম। সুতরাং কারও কারও মতে পয়ারের মত সটান ছন্দে সাধুশব্দেরই ন্যায্য অধিকার আছে—বাংলা কথার নেই। এর উত্তরে আমার বক্তব্য যে, যার পদে পদে ঝোঁক নেই, তাকে ছন্দ নামে অভিহিত করা যায় না। কাশিদাসী পয়ার গাওয়া যায় কিন্তু পড়া যায় না। যে পয়ার পড়বার জন্য রচিত হবে তাতে সাধুশব্দ চলবে না, কেননা সে শব্দের ঝোঁক নেই। ঝোঁক আর টান দুইয়ে মিলে এক না হলে ছন্দ হয় না। স্রোতের জল একটানা অথচ হিল্লোলিত অর্থাৎ সে জল সটান চলে কিন্তু ঝোঁকে ঝোঁকে। যে জলের ঝোঁক নেই—তার

গতিও নেই তার একটানা চেহারাটা শুধু অচলতার লক্ষণ। সুতরাং ঝোঁকপ্রধান বলে বাংলা শব্দ কেন উদার ছন্দের মধ্যে স্থান পাবে না বুঝতে পারছি নে। ইংরাজি শব্দও ত সব ঝোঁকপ্রধান, তৎসত্ত্বেও Iambic pentametre-এর মধ্যে তারা সজোরে বসে রয়েছে। বাংলা শব্দ যদি আট মাত্রার তাল অর্থাৎ মধ্যমানে পড়্‌তে রাজি না হয় তাতে কিছু আসে যায় না—কাওয়ালি ঠুংরিতে ঠিক বসে যাবে। সুতরাং মুখের কথায় সেকেলে পয়ার লেখা না গেলেও, তার চাইতে ঢের বেশি স্রোতস্বতী ছন্দে লেখা যাবে।

আমার এ সব কথা আমি কাউকে গ্রাহ্য করতে বলিনে, কেননা আমি জানি যে, আমি ভাদ্র মাসে জন্মায় নি। তবে কোনো বিষয়ে যখন একটা তর্ক ওঠে তখন সে বিষয়টাকে শুধু ভিতর থেকে নয় বাইরে থেকে দেখারও একটা সার্থকতা আছে, এই বিশ্বাসে আমি ছন্দসম্বন্ধে out-sider হিসাবেই আপনার অনুরোধ মত এ আলোচনায় যোগদান করতে সাহসী হয়েছি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

একটি সত্যি গল্প।

——:০:——

উচ্ছল উদ্দাম পার্ব্বত্য ঝরণা হু হু শব্দে পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটে চলেছে—যেন সে জানিয়ে দিতে চায় যে, এ জগতে গতির চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। সেই ঝরণার ধারে একটুখানি সমতল জায়গার উপরে ছোট্ট একটি কুটীর—আর সেই কুটীরে বাস করত এক তরুণ পাহাড়ি। তরুণ পাহাড়ির দিনমান কোনই কাজ ছিল না—সে তার কুটীরের চার পাশ বন্য গোলাপের গাছে গাছে ভরে' তুলেছিল—বন্য গোলাপ আরও কত রকমের ফুল লতা পাতা দিয়ে তার কুটীর খানিকে কুঞ্জবনের মত করে' তুলেছিল। দিনমান সে সেই ফুল লতা পাতার চর্চ্চা করেই কাটিয়ে দিত—কেবল সকাল বেলায় যখন প্রভাতী সূর্য্যের আলোর স্পর্শে পাহাড়ের গায়ের বরফ চিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একবার সেই ঝরণাটির ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। সেখানে গিয়ে ঝরণার অপর দিকে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাকত, যেন কার আসবার কথা আছে—যেন সে কার অপেক্ষায় সেখানে কুটীর বেঁধে রয়েছে। কিন্তু সারাবেলা দেখে দেখে যখন মাথার উপরে উঁচু পাহাড়ের বরফের সোনালি রঙ্ চলে' গিয়ে তা রূপোলি রঙে ঝিক্ ঝিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কুটীরে ফিরে আস্‌ত—আবার ফুলগাছগুলোর তত্ত্বাবধান, পরিচর্য্যা করত।

এমনি করে কিছু দিন কেটে গেল। একদিন তাকে আর অমনি ফিরে আস্‌তে হ'ল না। সে ঝরণার ধারে গিয়ে দেখ্‌লে যে অপর পারে একটা পাথরের উপরে চুপ করে' বসে রয়েছে এক সুন্দরী তরুণী, যেন পাষাণ ফেটে পদ্মফুল ফুটেছে।

মুহূর্ত্তে পাহাড়িকে কে যেন বলে' দিয়ে গেল যে এ সেই—যার অপেক্ষায় সে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াত। মুহূর্ত্তে পাহাড়ির অন্তরটা সার্থকতায় ভরে' উঠ্‌ল—তার চোখে পলক পড়্‌ল না—অনিমেষ নয়নে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেই সুন্দরী অপরিচিতা তরুণীকে।

অচেনা? অচেনা ত বটেই; কিন্তু তার মত চেনা ত আর কেউ নেই—আর কিছু নেই। বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে পলে পলে তারই অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গড়ে' উঠেছে—তারই আনন্দের ভিতর দিয়েই যে তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয়। এ পরিচয় ত এক দিনের নয়—এক কালের নয়—এ পরিচয় যে বহু দিনের, বহু কালের—কত জন্মের। অচেনাই বটে—কিন্তু অতি অন্তরতম।

পাহাড়ি জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওগো তরুণি, তোমার নামটি কি? তুমি আস্‌ছ কোথা থেকে?"

তরুণী উত্তর দিলে—"নাম আমার তরুণী—আস্‌ছি আমি বহুদিন হ'তে—বহুদূর থেকে।"

"বহুদিন হ'তে?—তবে ত তুমিই সেই—যার অপেক্ষায় আমি এতদিন কাটিয়েছি। বহুদূর থেকে!—তাই বুঝি আমি দিগন্তের কোলে কোলে তোমারই পায়ের নূপুরের গুঞ্জন শুনতে পেতুম—ঐ দূর বনান্তরাল থেকে যে বাতাস বয়ে' আস্‌ত তাতে তোমারই কুন্তলের সুরভী-ঘ্রাণ পেতুম—ঐ ঊর্দ্ধে বহুদূরে সুনীল গগনে তোমারই নীল

নয়নের অসীম দৃষ্টির গভীরতা আমার চোখে ধরা পড়্‌ত। তবে ত তুমিই সেই—তবে ত তুমি আমার-ই। ওগো তরুণি, আমাদের মিলন হবে কেমন করে? ওপার ছেড়ে এ পারে আস্‌বে না কি—?"

"তোমার নামটী কি?"

"নাম আমার কল্পশেখর।"

"কল্পশেখর, তোমার সাধ্য কি আমায় ধরে' রাখ্‌বে তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে—তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে ত আমার জায়গা হবে না। আর এই খরস্রোতা নির্ঝরিণীকেই বা আমি পেরিয়ে যাব কেমন করে—এ স্রোত যে মত্ত-মাতঙ্গকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চাইতে কল্পশেখর, তুমিই এধারে এস। ওধারে ঐ কুটীর তোমার গণ্ডী। কিন্তু এধারে ত কোন গণ্ডী নেই—এধারে দিগন্তের আলো, দিগন্তের বাতাস। সার দিয়ে ঐ যে পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত যুগ ধরে' মৌন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই অনন্ত যুগের স্বপ্ন এধারে। ঐ অনন্ত যুগের স্বপ্ন নিয়ে অনন্ত যুগের সাক্ষী হ'য়ে যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে তার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে কত পথ কত অপথ—কত উপত্যকা অধিত্যকা—কত অসমাপ্তি। এই পথ অ-পথ ধরে' উপত্যকা অধিত্যকার ভিতর দিয়ে এই অসমাপ্তির দিকেই আমরা যাত্রা কর্‌ব, কল্পশেখর—তুমিই ওধার ত্যাগ করে এধারে এস না।"

"তবে তাই আস্‌ব তরুণী।"

কল্পশেখর জলে নাম্‌ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অনুভব কর্‌লে যে তাকে নির্ঝরিণীর খরস্রোত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। কল্পশেখর তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে নির্ঝরিণীর তটে দাঁড়ালে। সাধ্য কি মানুষের এই খরস্রোতা অগভীর নির্ঝরিণী পায়ে হেঁটে পার হয়।

কল্পশেখর বল্‌লে—"শোনো তরুণী, মানুষের সাধ্য নেই এই খর-স্রোতা নির্ঝরিণী হেঁটে পার হয়। শোনো, চল আমরা দুজনে এই ঝরণা ধরে' উজানের দিকে চলে যাই। যেখানে এর পরিসর স্বল্প হবে সেখানে এটাকে আমি ডিঙ্গিয়ে যাব।" তরুণী বল্‌লে—"আচ্ছা চল।"

দু'জনে দু'পার দিয়ে ঝরণার উজানে যাত্রা কর্‌ল।

দু'জনে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে সোনালি সূর্য্য পূব গগনে উঠে মাঝ গগনে গিয়ে পড়ল—আবার সেখান থেকে ক্লান্ত দেহে রাঙ্গা মুখে পশ্চিমে ঢলে' পড়ল, কিন্তু ঝরণা তেমনি হুহু শব্দে ছুটে চলেছে, কোনখানেই তার পরিসর এমন সঙ্কীর্ণ হয় নি যে, কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যা যখন তার কাজল আঁখি নিয়ে, তার কালো আঁচল আকাশে উড়িয়ে প্রকৃতিকে নিস্তব্ধ হ'তে ইঙ্গিত কর্‌ল তখন তরুণী ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"কল্পশেখর।"

"কি ?"

"আর ত আমি হাঁটতে পারি না, কল্পশেখর।"

কল্পশেখর বল্‌লে—"তবে আজকার মত আমাদের যাত্রা শেষ। শোনো তরুণি, এইখানে আমরা দু'জনে রাত কাটাব। তারপর প্রভাত হ'লে আবার চল্‌ব।"

তারা সেইখানে নির্ঝরিণীর দু'ধারে দু'জনে শ্রান্ত দেহে বসে' পড়ল, দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকের স্তব্ধতার বুক চিরে হু হু শব্দে উদ্দাম উচ্ছল ঝরণা তাদের দু'জনার মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মতো অক্লান্ত বেগে ছুটে চল্‌ল।

ধীরে ধীরে চারিদিকে আঁধার নিবিড় হ'য়ে এল, সুন্দরীর নীলাঞ্চলে চুম্‌কির মতো, নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে' উঠ্‌ল। কৌতূহলী

হ'য়ে বুঝি তারা মুখর ঝরণার দু'পাশে এই দুটী মৌন প্রাণীকে দেখ্‌তে লাগল। কি চায় এরা ? কোন্ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে এরা ? পরিণাম কি হবে এদের ? তাই বুঝি তারা পরস্পরের মাঝে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল।

তার পরদিন প্রভাত হ'লে তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু যেমন ঝরণা তেমনি, কোথাও একটু সংকীর্ণ হয় নি, কোথাও তার গতিবেগ একটু মন্দ হয় নি—এ যেন অনন্ত কালের পথে অনাদি কাল থেকে ছুটে চলেছে। আবার সন্ধ্যা হ'ল, আবার নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে' উঠ্‌ল। আবার তারা বিশ্রাম করতে বস্‌ল।

পরদিন প্রভাতে আবার তারা চল্‌তে লাগ্‌ল, তার পরদিন—তার পর দিন, এমনি করে' তারা চল্‌তেই লাগ্‌ল। যতই তাদের আশা ব্যর্থ হচ্ছিল—ততই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, যতই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হচ্ছিল ততই তাদের উৎসাহ উদ্যম অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এমনি করে' কত দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কত উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে', কত পর্ব্বতচূড়া প্রদক্ষিণ করে' তারা সেই পার্ব্বত্য ঝরণার উজানে চল্‌ল। কিন্তু সে ঝরণার কোন পরিবর্ত্তন নেই—একই গতি, একই পরিসর, কোথায়ও এমন অবসর নেই যেখানে কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, সাহস করে' উল্লম্ফনের চেষ্টা কর্‌তে পারে। এমনি করে' পাঁচটী বৎসর কেটে গেল।

সেদিনও তারা চল্‌ছিল, হঠাৎ নির্ঝরিণীর হুহু শব্দকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে এক বিশাল গর্জ্জন তাদের কানে এসে বাজল। যেন সহস্র প্রভঞ্জন এ সৃষ্টিকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে সহস্র দিকে একসঙ্গে ছুটেছে—যেন সপ্ত সিন্ধুর লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মি সহসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে একসঙ্গে

পৃথিবার পায়ে এসে মাথা খুঁড়্‌ছে। কল্পশেখর একটু থেমে তরুণীকে বল্‌লে—"তরুণি শুন্‌ছ ?"

"শুন্‌ছি।"

"কিসের শব্দ এ ?"

"বুঝি মহাপ্রলয়ের ?"

"অগ্রসর হবার সাহস আছে ?"

"তুমি যেখানে যাবে সেখানে আমার ভয় নেই।"

"তবে চল।"

দুজনে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। তারা যতই অগ্রসর হতে লাগ্‌ল ততই সে গর্জ্জন প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে তারা সেই বিশাল গর্জ্জনের কারণ আবিষ্কার কর্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলাও বন্ধ হ'ল। কিন্তু হায় তাদের যাত্রা শেষ হ'ল না!

তারা যেখানটায় এসে পড়্‌ল সেখানে তাদের সাম্‌নে বিশাল প্রাচীরের মত এক খাড়া পাহাড় আপনার মাথা তুলে রয়েছে—একেবারে খাড়া—দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর এই খাড়া পাহাড়। উপরে তাকিয়ে তার উচ্চতার শেষ দেখা যায় না। যেন বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীর সকল কৌতূহলের, সকল আশা-আকাঙ্খার বাধা স্বরূপ যোজন-দীর্ঘ যোজন-উচ্চ এক খাড়া প্রাচীর তৈরী করে' এখানে বসিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের এখানেই গতির শেষ—আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। আর সেই পাহাড়ের মাথার উপর থেকে একটি প্রকাণ্ড জল-প্রপাত বিরাট গর্জ্জন করে' এসে পড়্‌ছে। এই প্রপাতই সেই ঝরণা হ'য়ে বয়ে গিয়েছে যার তীরে তীরে তারা এই পাঁচ বৎসর হেঁটে এসেছে। এই প্রপাতের শব্দই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত

হয়ে চতুর্গুণ শব্দে তাদের কানে এসে বাজ্‌ছিল। তারা সেই প্রপাত ও নির্ঝরিণীর সঙ্গম স্থলে নির্ঝরিণীর দু'পারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পশেখর ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

এতদিন অন্তত তাদের মিলনের চেষ্টা কর্‌বার উপায় ছিল, আজ তারও শেষ। হয় মিলন, নয় মিলনের চেষ্টা। চেষ্টাও যখন অসম্ভব, তখন জীবনে কাজ কি ? কিন্তু এত সহজেই নিরস্ত হব ? প্রথম বাধাতেই আ-জীবনের সাধনা পরাজয় মান্‌বে ? অসম্ভব! কল্পশেখরের অন্তর দেবতা ত তা মান্‌তে চায় না। এই দুরারোহ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন পথই নেই ? এই জলপ্রপাতেই নির্ঝরিণীর উৎপত্তি। সুতরাং সেখানেই এর শেষ। এই পাহাড়ের ওপরেই তাদের যাত্রা শেষ হবে—তাদের মিলন হবে। কল্পশেখর তার বামে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখ্‌ল। যতদূর দৃষ্টি চলে খাড়া পাহাড় পূর্ব্বে পশ্চিমে আপনাকে বিস্তার করে' নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন বল্‌ছে—মানুষ, তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা জল্পনা উদ্যম উৎসাহের এইখানে শেষ—যাও ধরিত্রীর সন্তান আপনার মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরে যাও।

এমন সময় সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে একবার কল্পশেখরকে আরবার তরুণীকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—যেন তাদের এখানে উপস্থিতির অর্থ সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে সে কল্পশেখরকে সম্বোধন করে' বল্‌লে—"তুমি কে ?"

"আমি মানব।"

তরুণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে ?"

"আমি মানবী।"

"কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

কল্পশেখর বল্‌লে—"আমরা আস্‌ছি সেই দেশ থেকে, যেখানে ফুল ফোটে আবার ঝরে' যায়—মানুষ জন্মে আবার মরে' যায়—যেখানে গড়ে আবার ভাঙে—ভাঙে আবার গড়ে—যেখানে আশার অন্ত নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, সাহসের সীমা নেই।"

"তোমরা মর্ত্ত্যের জীব?"

"আমরা মর্ত্ত্যের জীব।"

"কি চাও তোমরা?"

"তুমি কে?"

"আমি গন্ধর্ব্ব।"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—আমরা চাই পরস্পরের মিলন। এই পাঁচ বৎসর ধরে' আমরা এই নির্ঝরিণীর দু'তীর দিয়ে দু'জনে হেঁটে এসেছি—আর এই পাঁচ বৎসর ধরে' এই নির্ঝরিণী আমাদের মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মত বয়ে' গিয়েছে। জানি আজ আমাদের যাত্রার শেষ। কোথায়? ওইখানে—যেখান থেকে জলপ্রপাত পড়্‌ছে—ঐখানে নির্ঝরিণীর শেষ, ঐখানে বাধার শেষ, ঐখানে আমাদের মিলন হবে।"

"অসম্ভব।"

"কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"তোমাদের মিলন।"

"কেন অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"কেন অসম্ভব তা বল্‌তে পারিনে। তবে বোধ হয় মিলন হলে' সকল পাওয়ার, সকল চাওয়ার শেষ—তাই বুঝি অসম্ভব। শোনো মানব, এ চেষ্টা ছাড়—তোমরা ফিরে যাও।"

মানব উন্নত-শিরে বজ্র-কণ্ঠে বল্‌ল—"কখনও না।"

মানবী নত-নয়নে মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি কর্‌লে—"কখনও না।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন রাস্তা নেই গন্ধর্ব্ব?"

"তোমরা ফিরে যাও।"

"এ পর্ব্বতে আরোহণ করা কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"শোনো—তোমরা ফিরে যাও।"

"একি মানুষের অসাধ্য গন্ধর্ব্ব?"

"অসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য।"

"তবে সাধ্য।"

"আপনার অদৃষ্টকে বশ কর্‌তে চাও?"

"চাই।"

"নিতান্তই ফির্‌বে না?"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—ফির্‌ব কোথায়? ফেরা মানে মৃত্যু। আজন্ম যে স্বপ্ন অন্তরে সুপ্ত হয়েছিল—কৈশোরে যে স্বপ্ন অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্দেশ সন্ধানে ঘরছাড়া করেছিল—যৌবনে গত পাঁচ বৎসর ধরে' যে আকাঙ্ক্ষার মাদকতা এ দেহের অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে—সেই স্বপ্ন সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে বল, গন্ধর্ব্ব! মানুষের মন তুমি জান না।"

"বেশ তবে শোন। এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা আছে—কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে চাই অসীম ধৈর্য্য। তোমাদের তা আছে।"

"মানুষের ধৈর্য্যের সীমা নেই।"

গন্ধর্ব্ব বল্‌তে লাগ্‌ল—"এই যে পাহাড় এ প্রাচীরের মতো, যোজন দীর্ঘ—একেবারে প্রাচীরের মতো খাড়া। কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই প্রান্ত শুধু উপর থেকে ঢালু হ'য়ে নেমেছে। সেই ঢালু জায়গা দিয়ে এর উপরে ওঠ্‌বার পথ। এখন তোমাদের দু'জনকে নির্ঝরিণীর দু'তীর থেকে পর্ব্বতের দু'প্রান্তে পৌঁছিতে হবে। সেখানে পৌঁছে পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা দেখ্‌বে। দু'ধার থেকে দু'রাস্তা বরাবর চলে' পাহাড়ের উপরের একটা হ্রদের তীরে প্রকাণ্ড একটা শাল্মলী তরুর মূলে এসে মিলেছে। সেই হ্রদ থেকেই এই ঝরণার উৎপত্তি। ওই রাস্তায় যদি তোমরা পথ হারিয়ে না ফেল তবে সেই হ্রদের তীরে তোমাদের মিলন হ'তে পারে।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ যাত্রা শেষ হবে কত দিনে?"

গন্ধর্ব্ব উত্তর দিলে—"কত দিনে তা কে জানে—কে বল্‌বে সে কথা?"

গন্ধর্ব্ব অন্তর্ধান হ'ল।

কল্পশেখর তরুণীর দিকে ফিরে বল্‌ল—"তরুণী সাহস আছে?" তরুণী উত্তর দিলে—"আছে।"

"লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে না?"

"না।"

দু'জনে দু'দিকে যাত্রা কর্‌ল। কত দিনের জন্যে কে বল্‌বে?

* * * * *

সে দিন সূর্য্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখর বাতাসের গায় তাজা পদ্ম ও ভিজে শেওলার গন্ধ পেলে। কল্পশেখর বুঝ্‌ল যে গন্ধর্ব্ব যে হ্রদের কথা বল্‌ছিল সে হ্রদ আর বেশি দূরে নয়—তার যাত্রা শেষ হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। কল্পশেখর দ্রুত পদে চল্‌তে লাগ্‌ল। যখন চারদিক আঁধার হয়ে এল তখন সে হ্রদের তীরে এসে পৌঁছিল। চারদিকে চেয়ে সে হ্রদের উত্তর তীরে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখ্‌তে পেলে। বুঝ্‌লে এই সেই শাল্মলী তরু। কল্পশেখর হ্রদের তীর দিয়ে গিয়ে সেই শাল্মলী তরুর মূলে পৌঁছিল। তারপর তারি নীচে বসে' পড়্‌ল।

চারদিক তখন নিবিড় কালো আঁধারে ঢেকে গেছে—গভীর নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে। আলকাৎরার চাইতেও কালো সে আঁধার, মৃত্যুর চাইতেও গভীর সে নিস্তব্ধতা। এম্‌নি আঁধারের মাঝে, এমনি নিস্তব্ধতার মাঝে কল্পশেখর বসে' বসে' হাজার চিন্তার জালে তার মনটাকে জড়াতে লাগ্‌ল।

কল্পশেখরের ত আজ যাত্রা শেষ। কিন্তু তরুণী!—কোথায় সে? সে কি এই কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে' আস্‌তে পার্‌বে এই তার গম্য-স্থানে—এই তার কাম্য-স্থানে? পথে কত বিপদ কত আপদ অতিক্রম করে' না কল্পশেখর আজ এই হ্রদের তীরে কত বর্ষ পরে পৌঁছেচে—ওঃ কত বর্ষ—সে যেন সৃষ্টির আগে হতে—সারাজীবন যেন সে পথই চলেছে—এই সাহস এই ধৈর্য্য কি তরুণীর হবে?—ওঃ—তরুণি—তরুণি!

সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিভিন্ন করে' কার পায়ের শব্দ কল্পশেখরের কানে এসে বাজ্‌ল। কল্পশেখর উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে

চেয়ে দেখ্‌ল। নিবিড় আঁধারে কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু স্পষ্ট পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে কল্পশেখরের দৃষ্টি আঁধার ভেদ কর্‌তে সমর্থ হ'ল। সে দেখ্‌লে একটা মানুষের মূর্ত্তিই বটে—তারই পানে আস্‌ছে।

কল্পশেখরের শিরায় শিরায় শোণিত দুরন্ত নৃত্য লাগিয়ে দিল—তার হৃদয়ে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল। কল্পশেখর উঠে সেই মূর্ত্তিটার পানে অগ্রসর হ'ল। যখন তারা পরস্পর কাছাকাছি হ'ল তখন কল্পশেখর যেন অপরিচিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি তরুণী।"

মুহূর্ত্তে চারটি বাহু দুইটি দেহকে জড়িয়ে নিল—তাদের আজীবন ব্যর্থ প্রাণের অনন্ত পিপাসা নিয়ে, চারটি অধর একটা নিবিড় চুম্বনে যুক্ত হ'ল—তাদের আজীবন পরিপুষ্ট হৃদয়ের অদম্য কামনা নিয়ে। তারপর আজীবন সাধনার সিদ্ধিলাভের শেষে জীবনব্যাপী ক্লান্তি যেন তাদের দুটি শরীরের ওপরে একেবারে ভেঙে পড়্‌ল—তারা সেইখানে বসে' পড়্‌ল—তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে সেই পাষাণ শয্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল। পাষাণ-শয্যা?—না, সে-শয্যা পুষ্পের চাইতেও কোমল।

পরদিন প্রথম ঊষার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখরের ঘুম ভাঙ্‌ল। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়্‌ল। সফল তার জীবন। আজীবন সাধনার ধন আজ তার আলিঙ্গনে। কল্পশেখর আলিঙ্গন-বদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—একি !!!

উদ্যতফণা ফণিনীকে সাম্‌নে দেখ্‌লে পথিক যেমন লাফিয়ে উঠে দশ হাত পিছিয়ে যায়, তেমনি চক্ষের পলকে কল্পশেখর তাকে আপনার আলিঙ্গন মুক্ত করে' লাফিয়ে উঠে সেই পাষাণ শয্যার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। তারপর বজ্রাহতের মতো শূন্যদৃষ্টিতে তারি সারা-নিশার আলিঙ্গনবদ্ধা নিদ্রাভিভূতার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিদ্রাভিভূতা আলিঙ্গনচ্যুতা হ'য়ে ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌ল। পাষাণ শয্যা ত্যাগ করে' উঠে বস্‌ল। তারপর কল্পশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল!

কল্পশেখর কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুমি?"

"আমি তরুণী।"

কল্পশেখর পাগলের মতো হেসে উঠ্‌ল। সে হাসি আশে পাশে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে কোন্ এক প্রেতলোকের বিকট বীভৎস শব্দের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার করে' নিশির সঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে ঘৃণার স্বরে বলে উঠ্‌ল—"তুমি—তুমি তরুণী—এই লোল চর্ম্ম, বিরল দন্ত, মুখের উপরে শুক্‌নো চামড়ার মতো দু'খানা ঠোঁট—দীপ্তিহীন কোটরগত ঐ দু'টি চোখ—মাথায় কাশফুলের মতো সাদা একরাশ চুল—তুমি—তুমি—তরুণী!"

জরাগ্রস্ত রমণী করুণ বিষাদের হাসি হেসে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কল্পশেখরের কাছে এসে তার হাতখানি ধরে' তাকে হ্রদের তীরে জলের কিনারে নিয়ে গেল। তারপর আপনার কৃশ হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি বিস্তার করে' জলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"দেখ।" কল্পশেখর দেখ্‌ল।

কল্পশেখর দেখ্‌ল হ্রদের জলে আপনার প্রতিবিম্ব। পেশীহীন গণ্ডদ্বয়ে রসহীন চাম্‌ড়া ঝুল্‌ছে—সাদা ভুরুর নীচে কোটরগত দু'টি চক্ষু কুয়াশায় ঢেকে গেছে—মসৃণ ললাটে করাল কাল তার নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়েছে—আর মাথার ওপরে বরফের চাইতেও সাদা একরাশ চুল গুচ্ছে গুচ্ছে তার অস্থি-চর্ম্ম-সম্বল কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে। তরুণীর ধ্যানে এতদিন তার তা চোখেই পড়ে নি। কল্পশেখর দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়ল।

মানুষের দেহ তার মনকে ব্যর্থ করেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বন্ধু।

—:*:—

অজিতদের যে গ্রামে বসবাস, সে গ্রামে তাদের স্বজন বা স্বজাতীয় বল্‌তে কেউ ছিল না। তেমনতর একটি স্থানকে অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষ যে বাড়া করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করেছিলেন, তার কারণ তাঁর কাছে হয়ত স্বজন বা স্বজাতির চাইতে জল-বাতাস-আলোর খাতিরটা ছিল ঢের বেশি। অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যেন সমস্ত গ্রামের ভিতর ছিল গ্রাম্য-দেবতা, অথবা দেবতার চাইতেও উন্নততর কোন জীব। কারণ, তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে ক'জনের সঙ্গে আমার পরিচয়, তাঁদের ত জানি সবারই ভোগ-রাগ আছে, মানুষের হাতে তৈরী লুচি-সন্দেশ বা পোলাও পরমান্নে। কিন্তু অজিতদের গ্রামবাসীরা তাদের কাছে ছিল এতই হেয়, যে তাদের ছোঁয়া লাগ্‌লে অজিতদের বাড়ীর কুয়োটার পর্য্যন্ত জাতিপাত হবার সম্ভাবনা।

এই গ্রামে জয়হরি সরকার ছিল একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। জমি-জমা তার ছিল বিস্তর। আর নিজহাতেই সে চাষ-আবাদের কাজ কর্‌ত। জয়হরির ব্যবসা ঘৃণিত হলেও, তার সততার খ্যাতি গ্রামের ভিতর বেশ ছিল। তার মানের অভাব থাক্‌লেও, ধনের অসদ্ভাব ছিল না। জাতিতে জয়হরি ছিল নমঃশূদ্র। এই জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি হ'ল অজিতের বন্ধু।

অজিত আর ভজহরির মধ্যে কোন্ সূত্রে বন্ধুত্ব হ'ল, তার ইতিহাস একটুখানি বলে রাখা আবশ্যক। আন্তরিক প্রীতির যোগই এ বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। বর-কণের পরস্পরের হৃদয়ের প্রীতি বা প্রাণের আকর্ষণ ব্যতিরেকে, একমাত্র অভিভাবকদের মর্জিতেই যেমন তাদের উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়, তেমনিতর অজিত ও ভজহরির মধ্যে যে বন্ধুত্বের যোগ,—ও ব্যাপারটি অভিভাবকদের ইচ্ছাক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

অজিত যখন ছ'সাত বছরের বালক, তখন দেশে একটি নতুন ব্যামো দেখা দিয়েছিল। সেকালে পল্লীর পিতামাতার অন্তরে এই একটি সংস্কার ছিল, যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ পাতিয়ে পুত্র কন্যাদের ধর্ম্ম-সূত্রে যুক্ত না করলে, ধর্ম্মরাজের চর বা অনুচর বর্গের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে কারণ, নতুন ব্যামোটি যখন দেখা দিল, তখন চিকিৎসকের শরণাগত হবার আগ্রহ পল্লীবাসীদের ভিতর তেমন প্রকাশ পেলে না; বরং ধর্ম্ম-রাজের অনুচরবৃন্দকে একটি বন্ধনের অজুহাত দেখাবার জন্য ধর্ম্মকে স্বাক্ষী-রেখে "সই" পাতাবার বা বন্ধুত্ব স্থাপন করবার হুজুগটা পল্লীতে বড় বেশি বেড়ে গেল।

অজিতের ঠাকুরমা ছিলেন সেকালের গিন্নি। এমন কোন কুসংস্কার দেশে ছিল না, যার উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা না ছিল, দেশে এমন কোন আজগুবি কথা উঠ্‌ত না, যার উপর তিনি বিশ্বাস স্থাপন না করতেন। আকাশের অনন্তব্যাপী যে নীলিমা, ওটা একদিন একটা শামিয়ানার মতো মানুষের ঠিক মাথার উপরেই ছিল, হাত বাড়িয়ে বেশ ছোঁয়াও চল্‌ত। তারপর কোন্ আদ্যিকালের এক বুড়ি কোন রাজার বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে হাতের ঝাঁটাখানি তুলে যেমনি আকাশের গায়ে একটি বাড়ি মারলে, অমনি ক্ষোভে অভিমানে

নিকটের আকাশ কোন্ সুদূরে প্রস্থান করল,—এমনি ধরণের ঢের ঢের শিক্ষা অজিত তার ঠাকুরমার কাছে পেয়েছিল। তারপর পৃথিবীটা যে ত্রিকোণ, তিন মুড়োতে তিনটি ভীমকায় জন্তু,—সিংহ, হস্তী আর অজগর, পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে, আর এরাই ধরার পাপের ভার যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন এক একবার ঘাড় নাড়া দেয়, আর অমনি পৃথিবীতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়,—অজিত ইংরেজি ইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে যেদিন থেকে 'বিজ্ঞান পাঠ' পড়্‌তে সুরু করেছিল, সেই দিন থেকে ঠাকুরমার ঐ রকমের ধারণাগুলি দূর করবার জন্য তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক বিতর্ক করেছিল, কিন্তু তবু কৃতকার্য্য হতে পারে নি। দেশে নতুন ব্যামোটি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, তার "প্রিভেণ্টিভ" স্বরূপ একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধ পাতাবার যে হুজুগটা উঠেছিল, সেটা এহেন ঠাকুরমার কানে যেদিন এসে পৌঁছিল, সেদিন কাউকে ধরে তাঁর নাতিটির সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে দেবার তাঁর ব্যস্ততার আর পরিসীমা রইল না। কিন্তু ভদ্র-পরিবার গ্রামে একটিও ছিল না। গ্রামের ভিতর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল জয়হরি সরকার। তার পুত্র ভজহরি অজিতদের পাঠশালাতেই পড়্‌ত, আর বয়সেও সে ছিল অজিতের সমান। তারপর চেহারাখানিও তার ছিল বেশ ভদ্র-দস্তর। জাতিতে নমঃশূদ্র হলেও, একটি ব্রাহ্মণ কুমারের বন্ধু হবার যোগ্যতা গ্রামের ভিতর যদি কারু থাকে, ত সে হ'ল ভজহরি। ঠাকুরমা ভজহরিকেই মনোনীত করলেন।

যদিচ প্রাণের প্রীতিই বন্ধু দু'টির মিলনের সূত্র নয়, তবু যে পর্য্যন্ত অজিত গ্রামের পাঠশালাতে পড়েছিল, ভজহরিকে না হ'লে তার চল্‌ত না।

বাড়ীর ভিতর তার খেলার একমাত্র সাথী ছিল তার ছোট বোনটি—রেণুকা, আর পাঠশালাতে অজিতের প্রধান সঙ্গীই হ'ল ভজহরি। অজিত যখন পাঠশালা থেকে ফির্‌ত, গঙ্গাজলে তার দেহের পরিশুদ্ধি না হ'লে ঠাকুরমা অবশ্য তাকে স্পর্শ করতেন না। তবু জাতিতে ভজহরি তার চাইতে যে ঢের নীচু, সে কারণে পাঠশালার জীবনে অজিতের অন্তরে তার প্রতি কোনরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয় নি। কিন্তু অজিতের বাপ যখন জেলা কোর্টে ওকালতি কর্‌তে বস্‌লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অজিত পাঠশালার পড়া শেষ করে, সহরের ইংরেজি ইস্কুলে পড়তে সুরু কর্‌ল, তখন ভজহরির সম্বন্ধে অজিতের মনোভাবের বেশ একটু বিপর্য্যয় ঘট্‌ল। ছুটিতে অজিত যখন সহর থেকে বাড়ী আস্‌ত, ভজহরির সংসর্গ সে আদৌ আর বাঞ্ছনীয় মনে করত না; বরং অজিতের মনে একটা শঙ্কা থাক্‌ত, কখন বা ভজহরি ছুটে এসে বন্ধু বলে তাকে সম্বোধন করে। দু'জনের ভিতর যে আকাশ পাতাল প্রভেদ! ভজহরির প্রমোশন হয়েছে গ্রামের পাঠশালা থেকে বাড়ীর গো-শালাতে। আর অজিত সহরের ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। মা, খুড়িমা, মাসী, পিশি সবার কাছে অজিত ইংরেজিতে কত কথা কয়! জল আবশ্যক হ'লে, ছোট বোনটিকে আদেশ করে, 'রেণু! এক গেলাস ওয়াটার।' ভাত চাইতে হ'লে মাকে ডেকে বলে, 'মাদার, এক মুঠো রাইস্ দাও।' আবার ঠাকুর-মার কাছে গিয়ে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে,—'ঠাকুরমা, তুমি আমার গ্র্যাণ্ড মাদার।' তারপর চাকর-বাকর, অতিথি-অভ্যাগত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অজিত উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ইংরেজি পুঁথির পাঠ আবৃত্তি করে,—"আই মেট্ এ লেম ম্যান্ ক্লোজ টু মাই ফার্ম্ম,"

ইত্যাদি। ইংরেজিতে যে এতদূর বিদ্বান, সে গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশোনা ইতি করেছে এমন একটি কৃষক-বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে লজ্জিত না হবেই বা কেন? ভজহরি আবার জাতিতেও এমনি নীচ যে, তার হাতের জলটুকু মুখে তুলতেও নেই। তারপর ভজহরির পিতা জয়হরি সরকার সামান্য একজন হেলে। অজিতের বাপের সঙ্গে সে লাগে কোথায়? অজিতের বাপ জেলা কোর্টের উকীল, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজি ভাষাতে কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন। এমনি ধারা যথেষ্ট হেতু ছিল, যাতে করে অজিতের মনোবৃত্তিগুলো দিনে দিনে ভজহরির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠ্‌ল। তবু অজিতের বাড়ী আস্‌বার সংবাদটি কানে পৌঁছামাত্র, ভজহরির পিসিমা ভ্রাতষ্পুত্রের বেশ-ভূষা বেশ একটু পরিপাটি করে, তাকে সঙ্গে নিয়ে অজিতদের বাড়ী এসে হাজির হ'ত।

ভজহরির মাথার উশ্‌কো-খুশ্‌কো চুলগুলো তেলে-জলে বেশ করে চুপিয়ে দেওয়া হ'ত। পরণে তার থাক্‌ত রঙ্গীন জোলাটে কাপড়, ঘাড়ের উপর কোঁচানো ফুলদার একখানি চাদর। দু'হাতে তার রূপোর দু'গাছি বালা। তারপর ভজহরির কপালের উপর এসে পড়্‌ত, তার এক গোছা চুলের সঙ্গে সংলগ্ন রূপোর দু'টি ঘুন্‌টি। আর তার বুকের উপর ঝুল্‌ত রূপোর একটি পান।

কিন্তু ভজহরির এই সজ্জাটি তার পিসিমার প্রাণে যতই আনন্দ দান করুক না কেন, অজিতের অন্তরে আদৌ প্রীতির সঞ্চার কর্‌ত না। ইংরেজি ইস্কুলের বিদ্যা আর সহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অজিত যে কালে বাড়ী আস্‌ত, গ্রামের ভজহরি ছোঁড়াটা তার যে বন্ধু এ কথা স্মরণ করে, অজিত ঠাকুরমার গুরুতর অপরাধটি মনে প্রাণে কোনক্রমে

আর ক্ষমা করতে পারত না। ভজহরি পিসিমার সঙ্গে এসে অজিতদের অন্দর-বাড়ীতে যেমনি প্রবেশ করত, অজিত বাহির-বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একখানি চৌকী টেনে বসে, খুব করে' দু' পা নাচাত। এরপর অবশ্য, ভজহরি তার বন্ধুর সাহচর্য্য লাভের আশা ত্যাগ করে পিসিমার আঁচল খানিই বিশেষ করে আশ্রয় করত।

অজিত বিদ্যার সিঁড়ি এক একটি করে ডিঙ্গিয়ে যতই অগ্রসর হ'তে লাগল, তার বন্ধু ভজহরির স্মৃতি, কালির আঁচরটির মতো যেন ছুরি দিয়ে চেঁচে উঠিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করে ফেলল। এর পর ঠাকুরমার মৃত্যুতে গ্রামটির সঙ্গেও অজিতদের সম্বন্ধ এক রকম ঘুচল। আত্মীয় স্বজন বা স্বজাতি মোটেই যেখানে নেই, তেমনতর একটি স্থানে অজিতদের যে বস-বাস বজায় ছিল, তার একমাত্র হেতুই হ'ল—ঠাকুরমা। স্বামীর প্রেম-প্রীতির আকর্ষণী-শক্তি যেন গ্রামের মাটিতে জড়িয়ে থেকে ঠাকুরমাকে সেই খানেই আবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যু যে দিন ঠাকুরমাকেই সেখান থেকে টেনে সরিয়ে ফেলল, তখন আর গ্রামের ভিঁটে মাটি ত্যাগ করে একেবারে সহরে হবার পক্ষে অজিতদের কোন দিকে কোন বাধা রইল না।

অজিত এরপর স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার মাত্রাও তার দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। আর একটিবার তার মনের গতির চেহারা বদল হল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সোপানটি অতিক্রম করে এসে, অজিত একটিবার ফিরে চাইল। অমনি তার পনেরো বৎসরের সাধনার যে ধন তার মোহটা অনেকখানি কেটে গেল।

গ্রামের বিল-খাল, নালা-ডোবাতে বন্যার জল যখন প্রথমে এসে

পড়ে, তখন তার চলার ভঙ্গীতে, উৎক্ষেপ বিক্ষেপে, উদ্দাম গতিতে, কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দে তার আগমন-বার্ত্তা দশ জনকে জানিয়ে দেয়। জ্ঞানের আসার রীতিও যেন তাই। কিন্তু যে দিন তার পরিপূর্ণ, প্রশান্ত রূপটির দর্শন-লাভ ঘটে তখন চিত্তের সমস্ত বাড়াবাড়ি ভাব সমাহিত হয়ে আসে। সেই পূর্ণ জ্ঞানের আভাতে অজিতের মনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, তার বিদ্যার আস্ফালন, শিক্ষার অভিমান, বংশের গৌরব, জাতের বড়াই তার মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল।

তার প্রাণের উপর রুশীয় সোস্যালিজ্‌ম্ আর ফরাসী সাম্যবাদের ধ্বজা উড়্‌ল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ জীবনের চির-সাথী হ'ল। টলষ্টয়, গান্ধীকে অজিত তার জীবনের আদর্শ করল। মিল, টুরগেনিফ ইব্‌সেন্, বার্ণার্ড শ, গ্যালস্‌ওয়ার্থী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের অজিত তার গুরু-পদে অভিষিক্ত করল। দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বদ্ধ-বাতাসে অজিতের অন্তর পুরুষটি যেন হাঁপিয়ে উঠল। দেশের একদল নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে অজিত জাতীয় মনের আবহাওয়াতে বিপুল একটি পরিবর্ত্তন ঘটাতে প্রবৃত্ত হ'ল। সমাজ-সংস্কারকদের দলের একজন চাঁই হয়ে, অজিত দেশের সমাজটাকে ভেঙ্গে-চুরে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপর নতুন করে তার গোড়াপত্তন করতে কৃতসংকল্প পেল। পল্লীর উন্নতি সাধন আর দেশের নারী-জাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান, এই দু'টি তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল। লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত জন-সাধারণের অন্তরে আত্ম-সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলা, দেশের কৃষক শ্রেণীর মান বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে অজিত যেন একবারে উঠে পড়ে লাগল।

কিন্তু একদিকে অজিত যেমন দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে সারা হচ্ছিল, অন্যদিকে অজিতের পিতা অনাদিনাথ তেমনি পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বিশেষ করে মন দিয়েছিলেন। অজিত এম্ এ, পাশ কর্‌বার পর থেকে, অনাদিনাথ প্রতিদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়ে তাঁকে সেলাম জানিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর বেশ একটি সুযোগ উপস্থিত হ'ল। বিভাগীয় কমিশনার সাহেব অনাদিনাথের কোন এক মক্কেল-জমিদারের এলাকার ভিতর শিকার কর্‌তে এলেন। অনাদিনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে জমিদারের খরচায় রসদাদি জোগালেন, এবং যথা-বিধি তদ্‌বির-তদারক কর্‌লেন। এর ফলে, অনাদিনাথ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আর বিভাগীয় কমিশনার উভয়েরই বিশেষ প্রীতিভাজন হলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে হাকিমী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা পুত্র অজিত-মোহনের অনেকটা বেড়ে গেল। তবু একটা বাধা ছিল, অজিতের বয়সের অঙ্কে একটি বৎসর বাহুল্য হয়ে পড়েছিল। সেটি ঝেড়ে ফেল্‌তে অজিতের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে অজিত এমন একটি সত্য-পাঠ কর্‌ল, যার প্রধান অঙ্গই হ'ল—জল-জ্যান্ত একটি মিথ্যা!

যে পদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল চোরকে সাজা দেওয়া, সেই পদটি অধিকার কর্‌বার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চুরি বিদ্যাই অজিতকে অবলম্বন কর্‌তে হ'ল। তবে পরদ্রব্য অবশ্য নয়, আপনার বয়স চুরি, কাজটি হয়ত গর্হিত না হতেও পারে। তবু অজিতের বিবেক-বুদ্ধি তার প্রাণে যে হুল না ফুটিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু মাথার উপর ছিল তার পিতৃ-আজ্ঞা। পরশুরাম যে দেশের দশ-অবতারের এক অবতার, সেই দেশেতে জন্ম নিয়ে পিতৃ-আদেশ অমান্য করবে এমন সাধ্য কার?

কত যুগ যুগান্তরের শ্রদ্ধার ভারে যে সংস্কারটি মনের ভিতর কেটে বসেছে, একদিন ইচ্ছামাত্র সেটিকে মন থেকে সরিয়ে ফেলা, বড় সহজ কথা ত নয়। কাজেই দেশের উন্নতিকল্পে যে সব শুভ অভিপ্রায় আকাশের তারার মত অজিতের অন্তরে এক একটি করে ফুটে উঠেছিল, পিতৃ-আজ্ঞার সুমুখে এক নিমিষে সব যেন আকাশ কুসুমের মতো ঝরে পড়্‌ল। দেশ উদ্ধারের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে, চোর ডাকাতের দণ্ড-মুণ্ডের একটি বিধাতারূপে অজিত একদিন বিচার-আসন দখল কর্‌ল।

অজিতের কার্য্যকালের প্রথম দু'টি বৎসর কেটেছিল তার আপনার জেলাতে। সেই সময়ের একটি ঘটনা, নিতান্ত ক্ষুদ্র হ'লেও আজকের এই ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

যে গ্রামের মাটিতে অজিত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর যাকে জড়িয়ে-ছিল তার শৈশবের স্মৃতি, অর্দ্ধ যুগ বাদে আবার একটি দিন অজিত সেই গ্রামে পদার্পণ কর্‌ল। এবার অবশ্য গ্রামের একজন অধিবাসী রূপে নয়, একটি বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তকারী একজন হাকিম স্বরূপে। গ্রামে এসে অজিত তার বাড়ীর ভিঁটেতেই তাঁবু গাড়্‌ল। বাড়ীর ঘর-দুয়োর তখন একখানিও অবশিষ্ট ছিল না। ঘরগুলোর সব চালের খড় পচে খসে পড়েছিল। বাঁশের সাজ উঁইতে জীর্ণ করেছিল। মাটির দেয়াল বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধ্বসে পড়েছিল। ঘরের মেঝের উপর ঘাস-দূর্ব্বো গজিয়েছিল। আর বাড়ীর উঠোন এরণ্ড-আকন্দ, শুঁটি, ভেঁটি, তৃণ, লতা, গুল্মতে ভরে উটেছিল। বাড়ীর এই দৃশ্য কোন পরম আত্মীয়ের চরম দুর্দ্দশার মতো অজিতের মনকে বড়ই পীড়া দিতে লাগ্‌ল। আজ যেন অতীত তার মোহিনী রূপ ধারণ

করে অজিতের অন্তর মাঝে দেখা দিলে। রেণু,—আহা রেণু, আজ কোথায়? ছোট বোনটির কথা মনে আসতেই বেদনার একটি প্রবল উচ্ছ্বাস অজিতের প্রাণটার ভিতর ঢেউ তুল্‌ল। অজিতের মনে পড়্‌ল, পুজোর পর ইস্কুলের ছুটি যখন শেষ হয়, বাড়ী থেকে তার যাত্রার দিনে, সে যখন নদীর ঘাটে নৌকোতে এসে উঠ্‌ল, রেণু ঠাকুরমার আঁচলখানি ধরে ঘাটের পাড়ের উপর দাঁড়াল, আর নৌকোখানি যে পর্য্যন্ত না তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এল, রেণু সেইখানে ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দাদার নৌকোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেণুর কাছে সেই হ'ল অজিতের জন্মশোধ বিদায়।

ঠাকুরমা?—ঠাকুরমার ত স্নেহের অন্ত ছিল না। নিত্যি তিরিশ দিন সাঁঝের সময় মণ্ডপ-ঘরের দুয়োরে উপুড় হয়ে পড়ে অজিতের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতার কাছে তিনি কত প্রার্থনাই না করেছেন। আহা! ঠাকুরমাও আজ আর নেই।

অজিতের প্রীতি ও অনুরাগের যে ধারাটি দিনে দিনে শুকিয়ে এসেছিল, আজ আবার তাতে প্রবল জোয়ার এল। আর সেই জোয়ারে ভেসে এল আর একজনের স্মৃতি। সে হ'ল গ্রামের জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি সরকার। গ্রামের যে পাঠশালাতে অজিত ভজহরির সঙ্গে একত্রে পড়্‌ত, আজও সে পাঠশালা আছে। তবে যাঁদের যত্নে পাঠশালা গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল, তাঁদের অভাবে অনাদরের রূপ পাঠশালার ঘরে ফুটে বেরিয়েছে। ঘরের মেঝেতে এতই ধুলো জমেছে যে, একত্র কর্‌লে তার ওজন হয়ত এক মণের কম হবে না। ঘরের চৌকাঠ-কবাট কোথায় সব অদৃশ্য হয়েছে, আর তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য রয়েছে ক'খানি দর্‌মা।

বেঞ্চিগুলোর ভিতর কোনোখানির হয়ত একদিকের দুটো পায়া ভেঙেই গেছে আর সেই পায়ার পরিবর্ত্তে দুটো বাঁশের খুঁটো পুঁতে রাখা হয়েছে। একখানি বেঞ্চির গায়ে আজও লেখা রয়েছে, 'ভজহরি আমার বন্ধু।' অজিত একদিন তার ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কেটে ওবাক্যটি বেঞ্চির গায়ে লিখেছিল। এরপর অজিত যখন ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়্‌তে গিয়েছিল, তখন ভজহরির প্রতি তার কি অবজ্ঞা! আর ঠাকুরমা ভজহরিকে বড়ই অসামান্য একটি অধিকার দান করেছেন, এইটে বিবেচনা করে, অজিত তার ঠাকুরমাকে পর্য্যন্ত ক্ষমা কর্‌তে পারে নি। ঠাকুরমার কাছে অজিতের সে অপরাধের গুরুত্ব যেন আজ দশগুণ বেড়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের যে উচ্চ আকাশে অজিতের প্রাণটি একদিন ডানা মেলে ছিল, সেইখান থেকে অজিত লক্ষ্য করে দেখ্‌ল, ভজহরিকে হেয় জ্ঞান কর্‌তে পারে এমন কোন হেতু তার নেই। ভজহরির পেটে বিদ্যা নেই বটে, কিন্তু অজিতের বিদ্যাই বা তার কোন্ কাজে লাগ্‌ছে? অজিত ত একদিন দেশ-বিদেশের ঢের ইতিহাস মুখস্থ করেছিল। অমুক রাজার রাজত্বকালে অমুক দেশের রাজনীতিক বা সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল। অমুক সাম্রাজ্য কি ভাবে গড়ে উঠ্‌ল। অমুক দেশের অমুক সময়ের ধর্ম্ম বা সমাজ-বিপ্লব কি ভাবে সংঘটন হ'ল। অমুক সভ্যতার কি রূপ, কি নিদর্শন, কি আদর্শ, কি মূলমন্ত্র ইত্যাদি ঢের তথ্য অজিত জেনে ছিল। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা চুরি মোকদ্দমার রায় লিখে, অথবা বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তের রিপোর্ট লিখে যার জীবন কাট্‌ছে, তার দেশ-বিদেশের নানা তথ্য জেনে রাখবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আর শিক্ষার গুমরই বা কোথায়? অজিত যখন কলেজে পড়েছে, অনেক

রাত জেগে এথিক্‌সের সূত্রগুলো ধরে সে টানা হাঁচ্‌ড়া করেছে। সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেহারা অজিত পর্য্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তার জীবনের ফাঁকে সুবৃহৎ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রবেশ লাভ করেছে।

অজিতের মগজের ভিতর যে সব আইডিয়া একদিন ভিড় করেছিল, যদিও সে গুলো অন্তর্হিত হয়েছিল, তবুও তারা তার মনের উপর রেখাপাত করে গিয়েছিল। সেই রেখাগুলো আজ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে অজিত তার আপনার জীবনটাকে বড়ই খাটো করে দেখ্‌ল। আর তার কল্পনার দৃষ্টিতে কৃষক-পুত্র ভজহরির জীবনটাই মহিমাময় হয়ে উঠ্‌ল। অঙ্কিত মনে মনে ঠাহর কর্‌ল, ভজহরির যথেষ্ট সমাদর করে, ঠাকুরমার কাছে তার অপরাধের গুরুত্ব লাঘব কর্‌বে। সেই কারণে, ভজহরিকে ডাক্‌বার জন্য অজিত সেই দিন সাঁঝের আগে তার কাছে লোক পাঠাল।

প্রবল প্রতাপান্বিত যে পুলিশ-দারোগা তার উপরেও অজিতমোহন হ'ল দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতারূপী একজন হাকিম। ভজহরি ঘাড়ের উপর চাদরখানি ফেলে দিয়েই, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাকিম অজিতমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দৌড় দিল। আস্‌বার পথে, অজিতমোহন যে এককালে তার বন্ধু ছিল, এই দুরন্ত চিন্তাটি বারবার একটি বিভীষিকার মত ভজহরির অন্তরে উদয় হল। আর ভজহরি শঙ্কিত হয়ে সেটিকে তার সমস্ত মন দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বিশহাত দূরে থাক্‌তেই, ভজহরি জোড়-করে একেবারে নুইয়ে পড়ে মাটীতে কপাল ঠেকাবার উপক্রম করল। অজিত হাকিমী পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, মানুষের মনুষ্যত্বকে কোন রকমে খর্ব্ব হতে দেখ্‌লে, বড় বেশি খুসি

হ'তে পারত না। আর আজকের কথা ত ছিল স্বতন্ত্র। ভজহরি তার কাছে এতদূর খাটো হয়ে যে আসবে, এটা যদিও খুব স্বাভাবিক, তবু অজিতের কল্পনাকে যথেষ্ট পীড়া দেবারই কথা। তারপর যে এতদূর খাটো হয়ে এল, তাকে বন্ধু-সম্ভাষণে আপনার উচ্চতর প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে উন্নত করা, অজিতের পক্ষে বড় সহজ হ'ল না। দু'টো বিপরীত শক্তি তার প্রাণের ভিতর যেন ঠেলাঠেলি করতে সুরু কর্‌ল। একদিকে হাকিমী পদের মান-মর্য্যাদার দাবী আর অন্যদিকে তার আদর্শ-জীবনের উদার সাম্য-জ্ঞান, যেন দুটো ষাঁড়ের মত অজিতের মনের ক্ষেত্রে বিষম একটা হুড়াহুড়ি বাধিয়ে দিল। সেই লড়াই-এর একটু ফাঁকে একটি কথা অজিতের প্রাণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, "বন্ধু"। এ কথায় বক্তা ও শ্রোতা দু'জনেই সমান চম্‌কে উঠল। অজিত লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল, ভজহরি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।